HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক – ০১ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন এ সৌরজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবি ও রাসুল। মহানবি (সা.) ওপর পবিত্র কুরআন শরিফ অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআন শরিফে যত উত্তম আখলাক এবং প্রশংসনীয় গুণাবলির কথা বলা হয়েছে, তিনি সেসব গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্রে কোনো প্রকার মন্দ দিক ছিল না। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ।

একজন মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ সত্যবাদিতা, ধৈর্য, পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নারীর প্রতি সম্মানবোধ, মানবতাবাদী চেতনা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি থাকা দরকার তার সবগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মধ্যে ছিল। হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে, তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআনের অনুরূপ। অর্থাৎ কুরআনের পছন্দই ছিল তাঁর পছন্দ আর কুরআনের অপছন্দ বা অসন্তুষ্টিই ছিল তাঁর অপছন্দ বা অসন্তুষ্টি। আল্লাহ পাকের সকল হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নের মধ্যেই ছিল তাঁর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতায় ছিল তাঁর চরম অসন্তুষ্টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহানবি (সা.) -এর ধর্মের অনুসারী হয়ে মহানবির শেখানো ইবাদত-বন্দেগির বাইরে কোনো নিয়মকানুন অনুসরণ করে আল্লাহর অলি (বন্ধু) হওয়া যায় না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর সকল গুণকে নিজের মধ্যে অর্জন করাই একজন আদর্শ মুসলিমের চরম ও পরম লক্ষ্য।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

জন্ম পরিচয়: হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর জন্ম হয় বসন্ত মৌসুমে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার প্রত্যুষে। তার মায়ের নাম আমিনা এবং পিতার নাম আব্দুল্লাহ। জন্মের পূর্বেই মুহাম্মদ (সা.) -এর পিতা মারা যান। তাঁর জন্ম হয়েছিল সুবহে সাদিকের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সোমবার দিনটি ছিল বরকতময়, সৌভাগ্যপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল। এরূপ একটি বরকতময় দিনে তিনি নবুয়ত লাভ করেন, হিজরত করেন, মিরাজে গমন করেন এবং ইন্তেকাল করেন।

দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ' বা প্রশংসিত এবং তাঁর মা নাম রাখেন 'আহমদ' বা চরম প্রশংসাকারী। দুটি নামই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে তিনি মুহাম্মদ (সা.) নামে সমধিক পরিচিত।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

বংশ পরিচয়: হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ ছিল হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর উত্তর পুরুষ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবি ও রাসুল, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাস প্রসিদ্ধ হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর বহুকাল পূর্বে মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর বংশপরম্পরা ঊর্ধ্বদিকে প্রায় ৬০ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-এর সাথে মিলিত হয়েছে।

কুরাইশ বংশ ইসমাইলিয়দের অন্যতম প্রধান শাখা। এ বংশে ফিহর নামে একজন প্রতাপশালী লোক ছিলেন, তাকে 'কুরাইশ' বলা হতো। কুরাইশ শব্দের অর্থ সওদাগর। ইসমাইলের (আ.) বংশধর আদনানের পুত্র মাআদ হতে ফিহর উদ্ভূত হয়েছিল। এজন্য তাঁর বংশধরগণ ইতিহাসে 'কুরাইশ' নামে পরিচিত হয়েছেন। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফিত্রের বংশধর কুশাই মক্কায় ও হেজাজে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এসময় তিনি ধর্মীয় ও পার্থিব নেতা হিসেবে কুরাইশদের নেতৃত্ব পরিচালনা করেন এবং কুরাইশ বংশ তার আমলে ব্যবসায়িক ও সামরিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

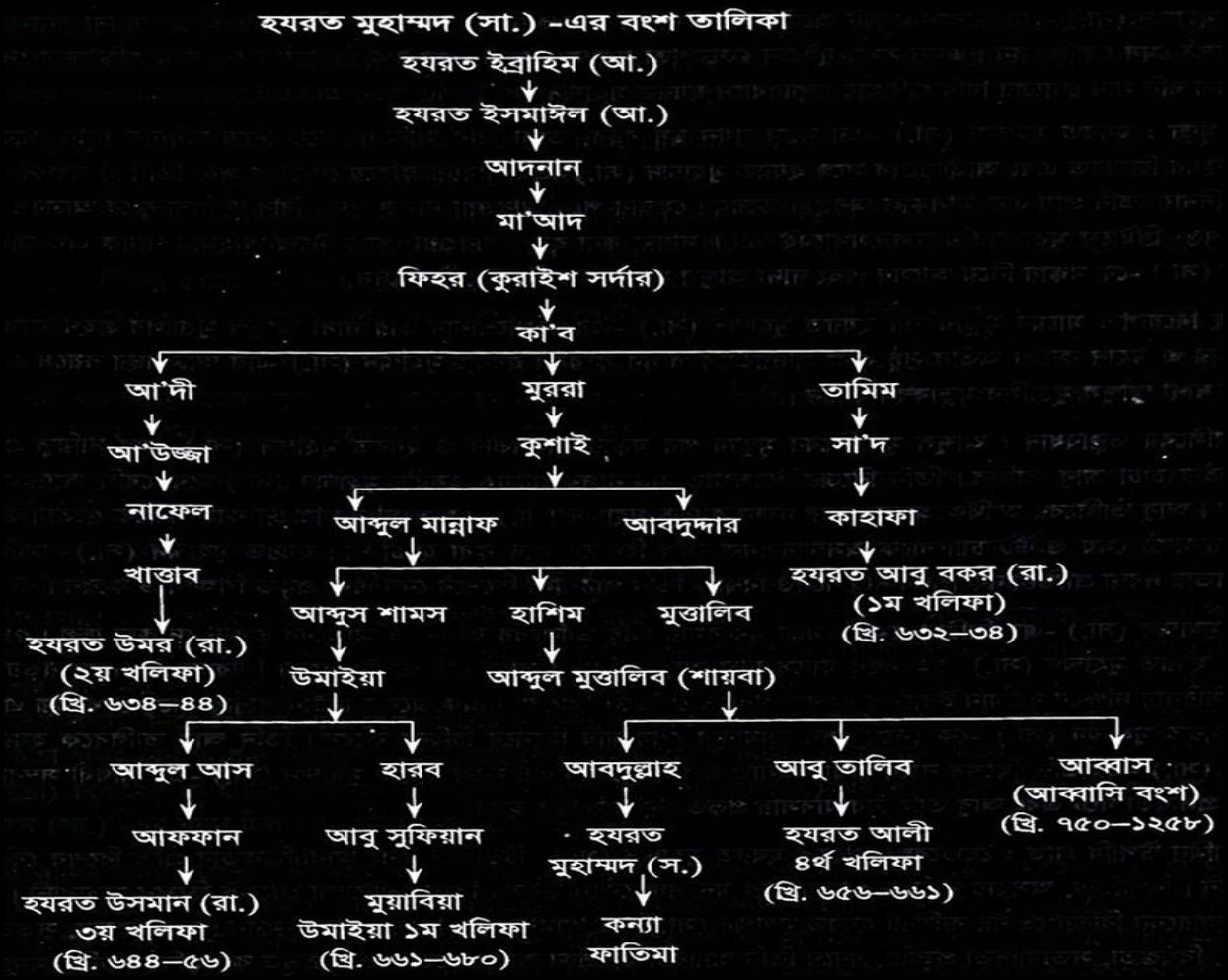

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

ধাত্রীগৃহে গমন ও বক্ষবিদীর্ণকরণ তথা আত্মপরিশুদ্ধকরণ: তৎকালীন নিয়মমাফিক সর্বপ্রথম তাঁর মা সায়্যিদা আমিনা তাঁকে প্রায় সাতদিন দুধ পান করান। এরপর কয়েকদিন পর্যন্ত আবু লাহাবের দাসী সুয়ায়বা তাঁকে দুধ পান করান। সে জামানার রেওয়াজ অনুযায়ী শহরের অভিজাত পরিবারের লোকেরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে দুধ পান করানো এবং তাদের লালন-পালনের জন্য গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানকার খোলা আলো-বাতাসে স্বাস্থ্য ভালো হবে এবং সন্তানেরা বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখতে পারবে বলে তাঁরা মনে করতেন। কেননা আরবের শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামগুলোর ভাষা অধিকতর বিশুদ্ধ বলে ধারণা করা হতো। এ নিয়ম অনুযায়ী গ্রামের মেয়েরা শহরে এসে অভিজাত পরিবারের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য সঙ্গে নিয়ে যেত। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে হাওয়ায়েন গোত্রের কতিপয় মহিলা শিশুর সন্ধানে মক্কায় আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে হালিমা সা'দিয়া নাম্নী এক মহিলাও ছিলেন। এ ভাগ্যবতী মহিলা কোনো ধনী পরিবারের শিশু না পেয়ে শেষপর্যন্ত আমিনার ইয়াতিম শিশু সন্তানকে নিয়ে যান। বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিন শিশু মুহাম্মদ তাঁর দুধভাই ও অন্যান্য বালকদের সাথে মাঠে মেষ চরাচ্ছিলেন। এমন সময় দুইজন ফেরেশতা মুহাম্মদ (সা.)-এর বক্ষ বিদারণ করে আত্মাশুদ্ধি করে দেন। তায়েফের বনি সাদ গোত্রের বিবি হালিমার তত্ত্বাবধানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

মাতার মৃত্যু: হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন বিবি আমিনা তাঁকে নিয়ে মদিনায় গমন করেন। স্বামীর কবর জিয়ারত এবং আত্মীয়দের সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি এ সফরে বের হন। মদিনায় তিনি প্রায় এক মাসকাল অবস্থান করেন। ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে বিবি আমিনা জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। আবওয়া থেকে উম্মে আইমান নামক এক মহিলা মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছে দেন।

পিতামহ বিয়োগ: মায়ের মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর দেখাশোনার ভার দাদা আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর এ মহান কর্তব্য অতীব সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে পালন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর আট বছর বয়সে ৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন।

আবু তালিবের তত্ত্বাবধান: আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার শাসনভার ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর চাচা আবু তালিব। তিনি নিজের ঔরসজাত সন্তানদের চেয়েও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বেশি আদর-যত্ন করতেন। আবু তালিবের আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন হয়ত মুহাম্মদ (সা.)-কে সংসারের বিভিন্ন কাজ করতে হতো। তবে সে সময় মাঠে মেষ ও উট চরানোকে অসম্মানজনক কাজ হিসেবে মনে করা হতো না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও বিশ্বকে তিনি পাঠশালা হিসেবে নেন এবং প্রকৃত শিক্ষালাভ করেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিরিয়া গমন: মক্কা মুকারমায় আবু তালিবের কাপড় ও আতরের একটি দোকান ছিল। ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ১২ বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সিরিয়ার দক্ষিণে বর্তমান ইরাকের বসরা নগরীতে পৌঁছলে 'বহিরা' নামক জনৈক খ্রিষ্টান পাদ্রীর সাথে দেখা হয় এবং তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখে শেষ জামানার শেষ নবি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি আবু তালিবকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রতি বিশেষ নজর রাখার জন্যও উপদেশ দেন। এর ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসারতা ঘটে এবং আবু তালিবের ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

আল-আমিন উপাধি লাভ: ছোটবেলা থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) চিন্তাশীল এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখাতেন। নিপীড়িত, অসহায় ব্যক্তিদের জন্য তাঁর মন সদা কেঁদে উঠত। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সত্যবাদী। এ কারণে আরবের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আমানতদার হিসেবে গ্রহণ করেন। নম্র ব্যবহার, সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি কারণে তিনি আরববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর প্রভূত কর্তব্যনিষ্ঠা, চরিত্র মাধুর্য, সরলতা, পবিত্রতা, সত্যের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি কারণে মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন। পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি সমগ্র আরবে 'আল-আমিন' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি গোটা জীবন এ নামের সার্থকতা রক্ষা করেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

হারবুল ফুজ্জার: প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে আরবের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসত। এসব মেলার মধ্যে বিরাট ও প্রসিদ্ধ মেলা ছিল 'উকাজ মেলা'। নানা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও কাব্য প্রতিযোগিতা, গান, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ইত্যাদি মেলায় হতো। একবার 'উকাজ মেলা' হতে ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের পবিত্র জিলকদ মাসে ভীষণ একটি যুদ্ধের সূচনা হয়। হাশেমীয় বংশের সাথে আরবের বিভিন্ন গোত্রও যোগ দেয়। এ যুদ্ধ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। এ যুদ্ধ কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের সাথে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন। 'পবিত্র মাসে বা যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বিধায় এ যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বা হারবুল ফুজ্জার নামে অভিহিত করা হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

হিলফুল ফুজুল গঠন: হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধের ভয়াবহতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিচলিত করে তোলে। তিনি যেকোনো যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সমাজ তথা মক্কাবাসীকে রক্ষা করার জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় আরবের কতিপয় উৎসাহী যুবক নিয়ে একটি শান্তি সংঘ গঠন করেন। এ শান্তি সংঘটি 'হিলফুল ফুজুল' নামে পরিচিতি।

হিলফুল ফুজুলের সদস্যরা আল্লাহর নামে শপথ করে প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করেন-

১. আমরা অসহায়, নিঃস্ব ও দুর্গতদের সেবা করব।

২. আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে অত্যাচারীকে বাধা প্রদান এবং উৎপীড়িতকে সাহায্য করব।

৩. আমরা দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করব, যাতে কোনো ব্যক্তি বা গোত্র শান্তিভঙ্গের কারণ না হতে পারে।

৪. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

৫. কোনো বিদ্রোহীকে মক্কায় আশ্রয় দিব না। বিদেশি বণিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

হিলফুল ফুজুল গঠন করা হয় ৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে। তবে অনেকের মতে, এটি গঠিত হয় ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, এটি হারবুল ফুজ্জারের যুদ্ধের পর গঠিত হয়। কিশোর বয়সে এ শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

মুহাম্মদ (সা.) -এর সাথে বিবি খাদিজার বিবাহ: আরবে বনু সাদ গোত্রে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ নামে এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিধবা। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন। বিবি খাদিজা (রা.) অত্যন্ত সম্মানিত ও সচ্চরিত্রের অধিকারী মহিলা ছিলেন। লোকেরা তাঁকে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে তাহিরা (পবিত্রা) বলে ডাকত। তাঁর অগাধ ধনসম্পদ ছিল। তিনি বিভিন্ন লোক নিয়োজিত করে ব্যবসায় করতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে খাদিজা (রা.) তাঁকে ব্যবসার তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। অতঃপর খাদিজা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর অসামান্য যোগ্যতা ও অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে প্রায় তিন মাস পর তাঁর কাছে নিজের সহচরী 'নাফিসার' মাধ্যমে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) চাচা আবু তালিবের সম্মতি নিয়ে বিয়েতে মত দেন। বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। বিবি খাদিজার বাবা ফিজর যুদ্ধে মারা যাওয়ায় তাঁর চাচা ওমর বিন আসাদ উপস্থিত থেকে বিয়ে দেন। আবু তালিব বিয়ের খুৎবা পাঠ করেন। পাঁচশ তালায়ী দিরহাম (স্বর্ণমুদ্রা) বিবাহের মোহরানা নির্ধারিত হয়। বিয়ের সময় বিবি খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর বয়স ছিল ২৫ বছর। সময় ছিল ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।

সৈয়দ আমির আলী বলেন, "এ বিবাহ রাসুল (সা.)-এর জন্য বয়ে এনেছিল শান্তি এবং প্রাত্যহিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি যা তাঁর মহান কাজে তাঁর মন প্রস্তুত করার জন্য অপরিহার্য ছিল।" হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর তিন পুত্র আর চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিন পুত্র হচ্ছে কাসিম, আব্দুল্লাহ (ডাক নাম তায়্যিব), তাহির এবং চার কন্যা হচ্ছে যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রা.)। তাঁর পুত্ররা মক্কাতে থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কন্যারা ইসলামের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন: ৫৯৩ সালে মক্কায় বন্যার ফলে কাবাগৃহের ক্ষতি সাধিত হয়। এতে কাবা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কাজের দায়িত্ব কুরাইশগণ চার ভাগে চার গোত্রের নিকট অর্পণ করে। ৬০৫ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কাবাঘর মানুষ সমান উঁচু হওয়ার পর হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। বনু আবদুদার এবং বনু আদি গোত্র মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। পরিস্থিতি তিক্ততায় রূপ নেওয়ার মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী কাল যে খুব প্রত্যুষে কাবাগৃহে প্রবেশ করবে, তাঁর ওপর হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত থাকবে। পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বপ্রথম কাবাঘরে প্রবেশ করলেন। সকল গোত্রপতিদের সম্মতিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিচারক নিয়োগ করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের চাদর মাটিতে বিছিয়ে দিলেন এবং নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদটি চাদরে রাখলেন। এরপর সকল গোত্রপতিদের তাদের নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে চাদর ধরতে বললেন এবং যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। তারা তাই করল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদটি যথাস্থানে স্থাপন করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ফয়সালা ছিল অত্যন্ত বিবেকসম্মত ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধির ফলে একটি মারাত্মক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাল্য ও মক্কা জীবন

হাজরে আসওয়াদ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

'নবুয়ত' শব্দটি আরবি 'নাবাআ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে সংবাদ। সে হিসেবে নবি শব্দের অর্থ সংবাদবাহক বা সংবাদদাতা। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির নিকট প্রয়োজনীয় খবরাখবর, সংবাদ তথা আল্লাহর নির্দেশসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাঁরা সংবাদদাতার ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরাই নবি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বৈবাহিক জীবন ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ৩৫ বছর বয়স থেকে বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য জানার ব্যাকুলতা স্থায়ী রূপলাভ করে। কাবা থেকে তিন মাইল দূরে জাবালে নূর বা নূর পাহাড় অবস্থিত। এ পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা আছে। এ গুহার নাম হেরা গুহা। গুহাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৯০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। প্রতিবছর এক মাস বিশেষ করে রমযান মাসে হেরা গুহায় তিনি গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়, "Solitude had indeed become a passion with him. Here in this cave he often remained whole nights plunged in profoundest throught deep in communion with the unseen yet all pervading God of the universe.'" অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নিকট নীরবতা প্রাণের মতো হয়ে উঠল। অদেখা সত্তার সঙ্গে তিনি গভীর ধ্যানে নিভৃত আলাপে অতিবাহিত করতেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

সেই সত্তা যিনি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিরাজ করেন।" পর পর পাঁচ বছর রমযান মাসে তিনি হেরা গুহায় বসে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটান। ৬১০ সালের মাহে রমযানের শেষ দশকে একদিন জিবরাঈল (আ.) এসে হাজির হলেন তাঁর সামনে।' তিনি বললেন, 'ইকরা' (পড়ুন)। রাসুল (সা.) বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। দ্বিতীয়বারও একই নির্দেশে রাসুল (সা.) নেতিবাচক জবাব দেন। একইভাবে তৃতীয়বার বললেন, 'ইকরা' (পড়ুন)। তখন রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়তে হবে? জিব্রাইল (আ.) বললেন, "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে। সে প্রভুর নামে পাঠ করুন। যিনি মহিমান্বিত, মানুষকে যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন।" (বিস্তারিত জানার জন্য পবিত্র কুরআনের 'সূরা আলাক' দ্রষ্টব্য।)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

হেরা পর্বতের গুহা

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

ইসলাম প্রচার: ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি সর্বপ্রথম সেসব লোককে ইসলামের দাওয়াত দেন, যাদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। মহিলাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.), ভৃত্যদের মধ্যে তাঁর খাদেম যায়দ ইবনে হারিস (রা.), বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) এবং বালকদের মধ্যে তাঁর চাচাত ভাই হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। ৬১০ সাল থেকে ৬১৩ সালের মধ্যে হযরত উসমান (রা.), আব্দুর রহমান, তালহা ও যুবাইরসহ ত্রিশজন ইসলাম কবুল করেন। গোপন প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামের কিছু বিস্তার হলে ৬১৩ সালে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ আসে, "ফাদা বিমা-তু'মারু অআ'রিদ্ব আনিল মুশরিকিন্।" অর্থাৎ "আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।" এ নির্দেশের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল মক্কাবাসীকে আহ্বান করে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত করেন। উপস্থিত জনতাকে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর দাওয়াত দেন এবং মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা, পৌত্তলিকতা
ইত্যাদির অসারতা সম্পর্কে বিস্তারিত যুক্তি তুলে ধরেন। পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিকতা বর্জন করে এক আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আসার আহ্বান জানান। তিনি সততা, নৈতিকতা, মানবতা, মানবসেবা প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক বিষয় পালনের কথা প্রচার করেন এবং শিরক, হত্যা, হানাহানি, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ, অত্যাচার ইত্যাদি অমানবিক কর্ম বর্জনের আহ্বান জানান। এ বাণীগুলো প্রচার করতে গিয়ে তিনি সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

কুরাইশদের অত্যাচার: মহানবি মুহাম্মদ (সা.) আরববাসীকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলী, যায়েদ, আবুবকর, বেলাল, উসমান, আব্দুর রহমান-বিন-আওফ, সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাস, যুবায়ের, তালহা প্রমুখ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন। চার বছরের মধ্যে প্রায় ৪০ জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মক্কার কুরাইশরা ছিল কাবার রক্ষক। কাবাকে কেন্দ্র করে সমগ্র আরবের পৌত্তলিকতার সাথে কুরাইশদের সামাজিক, ধর্মীয় পৌরোহিত্য ও অর্থ উপার্জনের পথ হারানোর ভয়ে স্বভাবতই তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে নানাভাবে বাধা দান করতে অগ্রসর হয়। প্রথমে কুরাইশগণ তাঁকে ধর্মদ্রোহী, পাগল ইত্যাদিরূপে ঠাট্টা করতে লাগল। এতেও কোনো ফল না হওয়ায় তারা তাঁকে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করতেও শুরু করে। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মুল জামিল এবং আবু জেহেলের স্ত্রী হিন্দা তাঁর পবিত্র মাথায় আবর্জনা নিক্ষেপ এবং চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করে। আবু জেহেল একদিন তাঁকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে আঘাত করে। হযরতের চাচা বীরকেশরী হামজা এ সংবাদ শুনবার সাথে সাথেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন। তিনি সোজা কাবাগৃহে গিয়ে আবু জেহেলকে শাস্তি দিয়ে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল অত্যাচার নীরবে মুখ বুজে সহ্য করতে থাকেন এবং নির্ভয়ে ইসলাম প্রচার করে চলেন। এবার মক্কাবাসিগণ অন্য উপায় অবলম্বন করে। তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কার রাজত্ব, সেরা সুন্দরী এবং অনেক কিছুই দেবার প্রলোভন দেখায়। কিন্তু এতেও তারা ব্যর্থ হয়। তিনি তাঁর কর্তব্য পথ হতে এক বিন্দুও পিছপা হননি। এর পর কুরাইশরা নবদীক্ষিত মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন শুরু করে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

কুরাইশদের অত্যাচার: মহানবি মুহাম্মদ (সা.) আরববাসীকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আলী, যায়েদ, আবুবকর, বেলাল, উসমান, আব্দুর রহমান-বিন-আওফ, সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাস, যুবায়ের, তালহা প্রমুখ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন। চার বছরের মধ্যে প্রায় ৪০ জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মক্কার কুরাইশরা ছিল কাবার রক্ষক। কাবাকে কেন্দ্র করে সমগ্র আরবের পৌত্তলিকতার সাথে কুরাইশদের সামাজিক, ধর্মীয় পৌরোহিত্য ও অর্থ উপার্জনের পথ হারানোর ভয়ে স্বভাবতই তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে নানাভাবে বাধা দান করতে অগ্রসর হয়। প্রথমে কুরাইশগণ তাঁকে ধর্মদ্রোহী, পাগল ইত্যাদিরূপে ঠাট্টা করতে লাগল। এতেও কোনো ফল না হওয়ায় তারা তাঁকে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করতেও শুরু করে। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মুল জামিল এবং আবু জেহেলের স্ত্রী হিন্দা তাঁর পবিত্র মাথায় আবর্জনা নিক্ষেপ এবং চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করে। আবু জেহেল একদিন তাঁকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে আঘাত করে। হযরতের চাচা বীরকেশরী হামজা এ সংবাদ শুনবার সাথে সাথেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

তিনি সোজা কাবাগৃহে গিয়ে আবু জেহেলকে শাস্তি দিয়ে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল অত্যাচার নীরবে মুখ বুজে সহ্য করতে থাকেন এবং নির্ভয়ে ইসলাম প্রচার করে চলেন। এবার মক্কাবাসিগণ অন্য উপায় অবলম্বন করে। তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কার রাজত্ব, সেরা সুন্দরী এবং অনেক কিছুই দেবার প্রলোভন দেখায়। কিন্তু এতেও তারা ব্যর্থ হয়। তিনি তাঁর কর্তব্য পথ হতে এক বিন্দুও পিছপা হননি। এর পর কুরাইশরা নবদীক্ষিত মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন শুরু করে। নব মুসলিম ইয়াসার এবং তার স্ত্রী সুমাইয়াকে তারা অত্যাচার করতে করতে শহিদ করে দেয়। হযরত বেলালকে তাঁর মনিব উমাইয়া উত্তপ্ত বালুকার অসহ্য উত্তাপে শোয়ায়ে বুকে শ্বাসরোধকারী পাথর চাপিয়ে রেখে দিয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেননি। অবশেষে আবু বকর বেলালকে বহু অর্থের বিনিময়ে তাঁর প্রভুর নিকট থেকে ক্রয় করে মুক্ত করেন। কুরাইশগণ অনেক নবদীক্ষিত মুসলমানদের বেদম প্রহার করে। তারা কাউকে পোড়াল এবং কাউকে বা অন্ধ করে দিল। কিন্তু কেউই সত্যের পথ হতে বিচ্যুত হলেন না।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুয়ত প্রাপ্তি

কুরাইশদের বিরোধিতার কারণ: সাম্যের ধর্ম ইসলাম প্রচারিত হলে কুরাইশরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ না করে মহানবি (সা.)-এর ওপর নির্যাতন অত্যাচার শুরু করে। বংশগৌরব ও আভিজাত্যাভিমানী কুরাইশকুল কিছুতেই এদের নীতিবিরুদ্ধ পরিবর্তন মেনে নিতে রাজি ছিল না। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "পূর্বতন বৈষম্য দূরীভূত করে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া তাদের রীতিনীতি বিরুদ্ধ ছিল।" ঐতিহাসিক যোসেফ হেল বলেছেন, "কুরাইশদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে যতটা প্রবল প্রতিবাদ ছিল, ইসলাম প্রবর্তিত (ধর্মীয়) শিক্ষাসমূহের বিরুদ্ধে ঠিক ততটা ছিল না।" তারা অন্ধ অহংকারে মুহাম্মদের (সা.) প্রভুত্ব এবং কুরআনের অনুশাসন কায়েম হবে এটি তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারল না। তারা তাদের প্রভুত্ব, তাদের স্বার্থ, মদ খাওয়া, নারী ভোগ বাদ দিয়ে সৎ ও সাধু জীবনযাপন করতে তারা অনীহা দেখায়। তাছাড়া কাবার কর্তৃত্ব ও পৌরোহিত্য হারিয়ে দরিদ্র হওয়ার ভয়ে কুরাইশকুল ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে দাঁড়াল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, প্রাণ থাকতে তারা কখনো তাদের পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিকতা বিসর্জন দিবে না। হযরতের এবং নব মুসলমানদের ওপর তারা দ্বিগুণ জুলুম এবং উৎপীড়ন চালাতে শুরু করে।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক – ০২ হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক – ০২ হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

হিজরত: 'হিজরত' একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করা। ইসলামি পরিভাষায়, হিজরত হলো দীন-ইমান রক্ষায় অপারগ হয়ে এক স্থান বা দেশ হতে এমন কোনো স্থান বা দেশে চলে যাওয়া, যেখানে দীন-ইমান রক্ষা করা নিরাপদ। প্রায়োগিক অর্থে বলা যায়, ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বর্তমান সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরী থেকে পবিত্র মদিনার উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গমন করাই হিজরত। ইসলামের ইতিহাসে দুটি হিজরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হলো মুসলমানদের একাংশের আবিসিনিয়ায় হিজরত। মুসলমানগণ হযরত উসমান (রা.)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম এ হিজরত করেন। অন্যটি মহানবি (সা.)-এর মদিনায় হিজরত। দুটি হিজরতের মধ্যে মূলত মহানবি (সা.) -এর মদিনায় গমনকেই হিজরত হিসেবে গণ্য করা হয়।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

নবুয়ত লাভ ও অমুসলিমদের অত্যাচার: হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহপাকের নবি ও রাসুল। তিনি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হেরা গুহায় নবুয়ত লাভ করেন। এরপর থেকেই হিজরতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শুরু। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রচারের ফলে মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে শুরু করে। অপরদিকে, মুসলিমদের ওপর অমুসলিম তথা কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অসহায় ও অসচ্ছল তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলতে থাকে। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার দেখে বিচলিত হয়ে উঠতেন। তাঁর দরদি মন কেঁদে উঠত। একদিন সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, এ আশায় তিনি ধৈর্যধারণ করতেন এবং অমুসলিমদের কাছে বিনয়ের সাথে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। একপর্যায়ে হিজরত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত

আবিসিনিয়ায় প্রথম গমন মক্কা হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত খ্রিষ্টান শাসিত একটি রাষ্ট্রের নাম ছিল আবিনিসিয়া। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশদের অত্যাচার হতে মুসলিমদের রক্ষার ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দের রজব মাসে ১ম দফায় ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলাকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন। এ হিজরতকারী ১ম দলটি আবিসিনিয়ায় সসম্মানে তিন মাস অবস্থান করে মক্কায় ফিরে আসেন। বিশ্বনবি আবিসিনিয়া ফেরত দলের নিকট আবিসিনিয়ার রাজার মেহমানদারির খুঁটিনাটি শুনে আনন্দিত হন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় গমন আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত করে প্রায় দুই মাস অবস্থানের পর মুসলমানরা ফিরে আসলে কুরাইশদের অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তবে সকল অত্যাচার সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে গেলে ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.) আবারও তাদেরকে আবিসিনিয়ায় যাবার আদেশ দিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, হিজরতকারী এ দলটির সাথে শীঘ্রই আরও নর-নারী যুক্ত হলো। ফলে তাদের মোট সংখ্যা হলো ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রীলোক। এ ঘটনা মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত নামে পরিচিত। কুরাইশরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে নাজ্জাসির কাছে আশ্রয়প্রাপ্ত মুসলমানদের ফেরত চাইলেও তিনি তাতে রাজি হননি।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত

আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব মুসলমানদের জন্য আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ হিজরতের ফলে ইসলাম ধর্ম আরবের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও সত্যতা বুঝতে সক্ষম হন এবং খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ হিজরতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-

১. মুসলমানগণ ইসলামের জন্য যাবতীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত; এমনকি নিজের জন্মভূমি থেকে হিজরতকে তারা আশীর্বাদ বলে মনে করে।

২. কোনো অবস্থাতেই ইসলাম ত্যাগ না করে মুসলমানগণ সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছে। মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত কুরাইশদের মনে সে ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল।

৩. মুসলমানগণ আরও বুঝতে পারে যে, কুরাইশদের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বহির্বিশ্বের আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

৪. আবিসিনিয়ার হিজরতই পরবর্তীতে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পথ উন্মুক্ত করে।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরাইশদের বর্জননীতি/শিয়াবে আবু তালিব: নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে আরবের শ্রেষ্ঠ বীর রাসুল (সা.)-এর চাচা হামজা (রা.) ও বীরশ্রেষ্ঠ হযরত উমর (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে মুসলমানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরূপে যখন মুহাম্মদ (সা.) -এর শক্তি দিন দিন বেড়ে চলল তখন নবুয়তের সপ্তম বছরে কুরাইশরা হাশিম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে অসহযোগ ঘোষণা করে। তারা মুসলমানদের সাথে কথাবার্তা, ক্রয়-বিক্রয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বন্ধ করে দেয়। হাশিম বংশীয় লোকদিগকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'শিআবে আবু তালিব' নামক নির্জন পার্বত্য উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহ মুসলমানগণ চরম অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। এ সময়ে রাসুল (সা.) হজের মৌসুমে দেশের বাইরের লোকদের কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরতেন। কুরাইশদের এ অন্যায় আচরণ বুঝতে পেরে আরবের কয়েকজন হৃদয়বান ব্যক্তি এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এর ফলে কুরাইশরা তাদের বয়কট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত

রাসুল (সা.) -এর দুঃখের বছর: কুরাইশদের বর্জননীতি পরিত্যক্ত হওয়ার পরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) গুরুতর মানসিক আঘাত পেলেন। নবুয়তের নবম বর্ষে ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজা (রা.)-কে এবং তাঁর পাঁচ সপ্তাহ পরে পিতৃব্য আবু তালিবকে চিরকালের জন্য হারালেন। খাদিজা (রা.) পঁচিশ বছর পর্যন্ত হযরত (সা.) -এর উপদেষ্টা ও সহায় ছিলেন। আজ তাঁর অভাবে রাসুল (সা.)-এর অন্তর শূন্য। জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তে আবু তালিবকে হারিয়ে তিনি শোকে-দুঃখে আরও মুহ্যমান হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে অসহায় বলে মনে করতে লাগলেন। আবু তালিব ছিলেন তাঁর শৈশবের একমাত্র অবলম্বন, যৌবনের অভিভাবক এবং পরবর্তী জীবনের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাই এ বছরকে অর্থাৎ ৬১৯ সালকে 'আমুল হুযন' বা দুঃখের বছর বলা হয়।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত

রাসুল (সা.) -এর তায়েফ গমন: যতদিন পর্যন্ত আবু তালিব জীবিত ছিলেন ততদিন কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সাহস পায়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শত্রুদের অত্যাচার প্রবল আকার ধারণ করে। রাসুল (সা.) কখনো মাতৃভূমি পরিত্যাগ করার কথা এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করেননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁর চরম শত্রুরাই একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কুরাইশদের শত্রুতায় অতিষ্ঠ হয়ে নবুয়তের দশম বছরে রাসুল (সা.)-তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তিনি দশদিন যাবৎ তাঁর ধর্মের বাণী তায়েফবাসীদের কাছে প্রচার করলেন। কিন্তু কোনো আশাপ্রদ ফল হলো না। তায়েফবাসী রাসুল (সা.)-কে নির্মমভাবে অত্যাচার করে শহর হতে তাড়িয়ে দিল। তিনি যখন মক্কায় ফিরছিলেন, তখন তায়েফবাসী তাঁকে অনুসরণ করে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছিল। এভাবে তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন তাঁর ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখছিলেন, ঠিক সে সময় আরবের এক কোণ হতে আলোর ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিল।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত

হজের সময় আসল। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াসরিব (মদিনার পূর্বনাম) হতে আগত ছয় জন লোক রাসুল (সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং উক্ত লোকগুলো তার বাণী শ্রবণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁদের নিকট তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করলেন এবং মক্কায় এটি প্রচার করতে গিয়ে তিনি যেসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, তা তাদের নিকট প্রকাশ করলেন। তিনি এটি জানতে চাইলেন যে, তাঁরা মদিনায় নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারবেন কিনা। প্রত্যুত্তরে তারা জানালেন যে, তারা তাঁর ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরাই পরস্পর কলহে লিপ্ত সেজন্য মুহাম্মদ (সা.)-কে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। দেশে গিয়ে তারা প্রচার করতে লাগলেন যে, মানুষকে অসৎ পথ হতে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আরবদের মধ্যে একজন নবির আবির্ভাব হয়েছে। প্রত্যেক বছর কাবা শরিফে মদিনা হতে দলে দলে লোক আসত। এরূপে অনেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর সংস্পর্শে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত

রাসুল (সা.) -এর মিরাজ গমন: প্রিয়জনদের হারিয়ে মহানবি (সা.)-এর হৃদয় ভারাক্রান্ত। এ সময়ে হযরতের জীবনের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা হলো 'মিরাজ'। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের রজব মাসের ২৭ তারিখে গভীর নিশীথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বোরাক নামক স্বর্গীয় বাহনে আরোহণ করে কাবাগৃহ হতে জেরুজালেম এবং সেখান হতে মানুষের জ্ঞানের অতীত উর্ধ্বলোকে গমন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর উর্ধ্বলোকে গমনকে 'মিরাজ' বলা হয়। এ সময় তিনি সৃষ্টিকর্তার দীদার লাভ করেন এবং দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্তের বদলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের নির্দেশ পান। রাসুল (সা.)-এর সশরীরে আল্লাহর সঙ্গে দীদার লাভ এবং মিরাজ গমন হযরত আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেন। তাই নবিজি তাঁকে সিদ্দিক উপাধি দেন। পবিত্র কুরআন শরিফের ১৭নং সূরার ১নং আয়াতে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আকাবার শপথ

মক্কা হতে কিছুটা দূরে অবস্থিত আকাবা একটি উপত্যকা। প্রাক-ইসলামি যুগেও হজব্রত পালন করা হতো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে লোকজন হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসত। মহানবি (সা.) হজের মৌসুমে লোকজনকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। মহানবি (সা.) -এর নিকট মদিনা হতে হজ মৌসুমে আগত লোকজন আকাবা নামক স্থানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মহানবি (সা.) তাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেন এবং এ বিষয়গুলো মেনে চলবে এ মর্মে শপথ নেন। এ শপথ আকাবা শপথ নামে পরিচিত। মোট তিনবার আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছিল:

১. আকাবার প্রথম শপথ: নবুয়তের দশম বছরে (৬২০ খ্রিষ্টাব্দ) আকাবার প্রথম শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় হজের মৌসুমে মদিনার খাজরাজ গোত্রের ৬ জন লোক মক্কায় এসে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মদ (সা.) -এর সম্পর্কে খবর শুনতে পায়। এ ব্যাপারে তারা আকাবা নামক স্থানে বসে আলাপ করতে থাকে। এমন সময় রাসূল (সা.) তাদের কাছে 'ইসলামের দাওয়াত দেন। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল (সা.)-এর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। ইতিহাসে এটিই আকাবার প্রথম শপথ নামে পরিচিত।

২. আকাবার দ্বিতীয় শপথ: নবুয়তের একাদশ বছরে (৬২১ খ্রিষ্টাব্দ) আউস ও খাজরাজ গোত্রের ১০ জন এবং অন্য গোত্রের ২ জন মোট ১২ জন মদিনাবাসী আকাবা নামক স্থানে সমবেত হয়। তারা রাসুল (সা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এটি আকাবার দ্বিতীয় শপথ হিসেবে পরিচিত।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আকাবার শপথ

৩.আকাবার তৃতীয় শপথ: নবুয়তের দ্বাদশ বছর মদিনার আউস গোত্রের ১১ জন এবং খাযরাজ গোত্রের ৬২ জন মোট ৭৩ জন নারী-পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাসুলের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য মক্কায় আগমন করে। তারা আকাবা নামক স্থানে রাসুলের হাতে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করে যে, আমরা আপনার ও ইসলাম প্রচারের জন্য এভাবে জীবন উৎসর্গ করব যেভাবে নিজ পরিবার-পরিজন ও ইজ্জতের জন্য করে থাকি। এটিই আকাবার তৃতীয় শপথ।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আকাবার শপথ

আকাবার শপথের মূল বিষয়: আকাবা নামক স্থানে মহানবি (সা.) -এর নিকট মদিনাবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক নিচের বিষয়ে অঙ্গীকার করেন-

১. আমরা এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করব, তাঁকে ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করব না এবং কাউকেও আল্লাহর সাথে শরিক (অংশীদার) করব না।

২. আমরা চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোনো প্রকারের অন্যায় কাজে লিপ্ত হব না।

৩. আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হব না।

৪. আমরা কোনো অবস্থায় সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না।

৫. আমরা কারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না।

৬. আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে মহানবির অনুগত থাকব, কোনো ন্যায়বিচারে অবাধ্য হব না।

আকাবার ২য় শপথের পরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসাব ইবনে উমায়রকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। তিনি (মুসাব) মদিনাবাসীকে (তখন নাম ছিল ইয়াসরিব) কুরআন পড়ানো, ইসলামি শিক্ষা দিতেন। মদিনায় তিনি 'মুকরি' (প্রশিক্ষক) নামে পরিচিত ছিলেন। মুসাব মদিনায় নামাযে ইমামতি করতেন। অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, মদিনাবাসী একজন প্রশিক্ষক পাঠানোর জন্য রাসুল (সা.)-এর নিকট চিঠি দেন। মহানবি (সা.) মুসাব ইবনে উমায়রকে মদিনায় প্রেরণ করেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আকাবার শপথ

আকাবা শপথের গুরুত্ব: ইসলামের যুগসন্ধিক্ষণে আকাবার শপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মূল ভিত রচিত হয়েছিল আকাবা শপথের মধ্য দিয়ে। নিচে আকাবা শপথের গুরুত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হলো-

১. ইসলাম প্রসারের সম্ভাবনা এ শপথের মধ্য দিয়ে মক্কাবাসীদের ইসলাম বিরোধিতা, প্রতিবন্ধকতা ও দুঃসহ অধ্যায় পেরিয়ে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

২. বিজয়ের পূর্বশর্ত: যেকোনো বিপ্লব সফল হওয়ার জন্য একদল আত্মত্যাগী কর্মী বাহিনী অপরিহার্য। আকাবার শপথের মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবের সে পূর্বশর্ত পূরণ হয়।

৩. ইসলামের দ্রুত প্রসার: আকাবার শপথের প্রেক্ষিতে রাসুল (সা.) মদিনায় ইসলাম প্রচারক দল প্রেরণ করেন। প্রচারকদলের একনিষ্ঠ ভূমিকায় মদিনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে।

৪. নির্যাতিত মুসলমানদের আশ্রয়স্থল: আকাবার শপথের মাধ্যমে মদিনাবাসীরা মুসলমানদের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ফলে মক্কায় নির্যাতনের সম্মুখীন মুসলমানেরা নিরাপদ আশ্রয়স্থলরূপে মদিনাকে গ্রহণ করে।

৫. ইসলামের আদর্শিক বিজয়: আকাবার শপথ ছিল ইসলামের আদর্শিক বিজয়। আকাবার শপথ জাহিলিয়াতের ঘোর তমসা দূর করে ইসলামের সাফল্যের গতিপথে জোয়ার সৃষ্টি হয়। এ গতি ইসলামের বিজয়কে ক্রমে অনিবার্য করে তোলে।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

আকাবার শপথ

৬. হিজরতের ভূমিকাস্বরূপ: আকাবা ছিল রাসুল (সা.) -এর মদিনায় হিজরতের ভূমিকাস্বরূপ। এ শপথে অংশগ্রহণকারীরা রাসুল (সা.)-কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করেন। অতঃপর রাসুল (সা.) মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেখানে হিজরত করেন।

৭. বিজয় সূচনা: আকাবা শপথের পর থেকে ইসলামের বিজয় অভিযানের সূচনা হয়। ঐতিহাসিকগণ এ শপথকে ইসলামের বিজয় অভিযানের মাইলফলক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

হিজরত মুহাম্মদ (সা.) -এর জীবনকে প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। যথা- মক্কা জীবন ও মদিনা জীবন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মক্কা জীবনে তাওহিদ ও রিসালাত সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এসময়ে মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান, পার্থিব জীবনের সকল কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ২২নং সূরা ছাড়া মাক্কি সুরাসমূহে 'হে মানবজাতি' কথাটি উল্লেখ আছে কিন্তু মাদানি সূরাগুলোতে 'হে মুমিনগণ' বলে মহান আল্লাহ পাক সম্বোধন করেছেন। কাজেই হিজরত সম্পর্কে জানার গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবি (সা.) -এর মদিনায় হিজরতের কারণ, ঘটনা, ফলাফল প্রভৃতি বিষয়াদি নিচে আলোচনা করা হলো:

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

মদিনায় হিজরতের কারণ

১ . ঐতিহাসিক কারণ: বিভিন্ন নবি-রাসুলের জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোনো নবি-রাসুল তাঁর নিজ জন্মভূমিতে দীন প্রচারের জন্য নিজ জাতির নিকট শুরুর দিকে শতভাগ সহযোগিতা পাননি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মক্কা জীবন বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা পাওয়া যায়। মক্কার কুরাইশদের নিকট হতে ইসলাম প্রচারে যে পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। আর কোনো পক্ষ হতে সে পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়নি। তাই বিগত নবি-রাসুলের মতো মুহাম্মদ (সা.)-কেও মদিনায় হিজরত করতে হয়েছে।

২. আবহাওয়াগত কারণ: তৎকালীন মক্কা ও মদিনা শরীফের জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মক্কার চেয়ে মদিনার জমি ছিল উর্বর এবং তুলনামূলক উত্তম। মদিনার আবহাওয়া ছিল আরামদায়ক। আবহাওয়া রুক্ষতার কারণে মক্কানগরীর লোকজনের মন-মেজাজ ছিল রুক্ষ। পক্ষান্তরে, মদিনার লোকজন ছিল নরম স্বভাবের, দয়ালু ও পরোপকারী। সে কারণে মদিনার লোকজন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মদিনায় যেতে আমন্ত্রণ জানান।

৩. মদিনাবাসীর আগ্রহ: মক্কাবাসীদের তুলনায় মদিনাবাসী ছিল তুলনামূলক ধর্মভীরু। তারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব পড়ত এবং ধর্মবেত্তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখত। মদিনার অনেকেই জানত যে, শেষ জামানায় একজন নবি ও রাসুল আসবেন এবং তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। এজন্য তারা সেই নবির উম্মত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

৪.ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত: ইমান বিশ্বাসগত বিষয়। মক্কাবাসী আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদকে দেখেছে, তার আমানতদারি, সততা, নম্রতা, সহনশীলতা ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেনি। পুরাতন ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার মানসিকতায় মক্কাবাসীরা ইসলামের বিরোধিতা করেছে। তৌরাত, ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও তারা পৌত্তলিকতার কাছে অন্ধ হয়েছে।

৫. আবু তালিব ও খাদিজার ইন্তেকাল: ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর জন্য দুঃখের বছর Year of Sorrow. হযরত খাদিজা ছিলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনী, সান্ত্বনাদাতা, পরামর্শদাতা ও উৎসাহদাতা। আর আবু তালিব ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর ছাতার মতো। মক্কাবাসীদের অত্যাচার হতে মুহাম্মদ (সা.)-কে রক্ষার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল কাজ করেছেন। আবু তালিবের মৃত্যুতে মুহাম্মদ (সা.) গোত্রীয় নিরাপত্তা হতে বঞ্চিত হন।

৬. আত্মীয়তা: রাসুল (সা.) শান্তিপ্রিয়ভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফে গমন করেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। তায়েফের পরে তিনি মদিনায় যাওয়ার মনস্থ করেন। মাতৃকুলের দিক হতে মদিনাবাসী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ও প্রপিতামহ হাশিম মদিনায় বিবাহ করেছিলেন। হযরত খাদিজা ও পিতৃব্য আবু তালিবের অনুপস্থিতিতে তিনি মদিনাবাসীদের সাহায্য পাবেন বলে আশা করেছিলেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

৭. ধর্মহীনতা: পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ফলে এ কিতাবগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য ঠিক ছিল না। ফলে মদিনাবাসীর নৈতিক চরিত্রের ওপর এ দুই ধর্মের কোনো প্রভাব ছিল না। যেহেতু ধর্মহীন সমাজ জীবনধারণের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাধা বৃদ্ধি পায়।

৮. স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর বিরোধিতা: কয়েক শ বছরের পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে চাইলে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত লাগবে আর সুবিধাভোগী গোষ্ঠী নতুন সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা করবেই। রক্তের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তে ইসলামি বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাধার সম্মুখীন হয়েছেন।

৯. পৌরহিতদের বিরোধিতা: সামাজিক মর্যাদা, পৌরহিত্য, আর্থিক সুবিধা, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি হারানোর ভয়ে অনেকেই ইসলামের বিরোধিতা করেছে।

১০. মদিনায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ: মক্কার চেয়ে মদিনা ছিল ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য অধিক উপযোগী। কারণ মদিনা থেকে সিরিয়া, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করার সুবিধা ছিল। এ কারণে তৎকালীন মদিনা বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। মুসলিম ব্যবসায়িগণ এ কারণে মদিনায় হিজরত করতে অধিক উৎসাহিত ছিলেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

১১. আকাবার শপথ: আল আকাবা মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত একটি গিরি উপত্যকা। হজের মৌসুমে মদিনাবাসীরা এ স্থানে তাঁবু ফেলত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর পর তিন বছর ৬২০, ৬২১ ও ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হজের মৌসুমে মদিনাবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেন। এর ফলে শতাধিক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ মুসলিম মদিনাবাসীরা মদিনায় ইসলামের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ফলে মদিনায় হিজরতের একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়।

১২. আউস ও খাযরাজ গোত্রের আহ্বান: মদিনায় আউস ও খাযরাজ গোত্র ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। কিন্তু বহু বছর পূর্ব থেকে এ দুই গোত্রের মধ্যে গোত্রীয় কলহ লেগেছিল। উভয় গোত্র একজন নিরপেক্ষ, অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার অভাব অনুভব করত। লোকমুখে মদিনাবাসী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশ্বস্ততা, সততা, সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা ও আধ্যাত্মিকতার কথা জানতে পারে। ফলে উভয় গোত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মদিনায় হিজরত করতে দাওয়াত দেন। ধর্মীয় দিক থেকে হিজরত অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে রাসুল হিসেবে গ্রহণ এবং রাজনৈতিক দিক হতে হিজরত অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মদিনায় অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত গোত্রগুলোর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ।

১৩. স্বপ্ন: হিজরতের পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হিজরতের স্থান বা দেশ সম্পর্কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, "হাকিম আবু আব্দুল্লাহ সূত্রে সা'আদ ইবন মুসাইয়র সুহায়ব সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরত ভূমি দেখানো হয়েছে। তা দেখানো হয়েছে দুই কঙ্করময় - ভূমির মাঝখান থেকে। তা হবে হিযর বা ইয়াসরিব।"

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

১৪. মুয়াল্লিমদের রিপোর্ট: হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলিমদের অনেক আগে থেকেই মদিনায় প্রেরণ করতে শুরু করেন। বুখারি শরীফের ১৬৯৩ হাদিস সূত্রে জানা যায়, মুসাব ইবন উমায়র, ইবনে উম্মে মাকতুম প্রথম মদিনায় হিজরত করেন। এরপর হযরত বেলাল, সা'দ ইবনে আক্কাস ও আম্মার ইবনে ইয়াসের। হযরত উমর (রা.) ২০ (বিশ) জন সাহাবির সাথে মদিনায় হিজরত করেন। এভাবে মুসলিমদের পক্ষে মদিনায় হিজরতের ক্ষেত্র তৈরি হয়।

১৫ . দারুল নাদওয়ার বৈঠক: মক্কার অমুসলিম কুরাইশরা দেখল যে, মক্কার বাইরে ইসলামের একটি শক্তিশালী সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। তারা মুহাজির সাহাবিদেরও বের হয়ে তাদের নিকট যেতে দেখেন। এতে কাফেরদের মনে আশঙ্কা জাগে যে, হয়তবা মহানবি (সা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছে। মক্কার কুরাইশরা আলোচনা করার জন্য 'দারুল নাদওয়ায়' সমবেত হয়। আর এ 'দারুল নাদওয়া' ছিল কুসাইব ইবন কিলাব-এর গৃহ। কুরাইশরা পরামর্শের জন্য এখানে সমবেত হতো। তারা এ দিনটির নাম দেয় 'ইয়াওমুন যাহমা' বা একত্রিতের দিন। এ পরামর্শ সভায় শয়তান নাজদের একজন শায়খের রূপ (শারীরিক আকৃতি) ধারণ করে উপস্থিত ছিল।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

১৬. মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র: মক্কার কাফিররা যখন দেখল তাদের আধিপত্য দিন দিন খর্ব হয়ে আসছে। তারা যখন দেখল মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীরা নিজ নিজ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি নিয়ে মদিনায় চলে যাচ্ছে, তাদের সাথে মদিনার প্রভাবশালী আউস ও খাজরায গোত্র রয়েছে, তখন তাদের মনে ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তখন তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। আবু জাহেল প্রস্তাব করল, আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন যুবক তরবারি নিয়ে মুহাম্মদকে অনুসরণ করুক এবং সুযোগ পেলে একসাথে আঘাত করে হত্যা করুক। তাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে আল্লাহর নির্দেশে আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে রাসুল (সা.) মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

১৭. আল্লাহর প্রত্যাদেশ: মহান আল্লাহ পাক মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন, "বল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের কর কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি।" আল্লামা কাতাদা (রহ) বলেন, 'প্রবেশ করাও' বলতে মদিনা শহরে এবং 'বের করাও' বলতে মক্কা শহরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে আল্লাহর নির্দেশ কুরাইশদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মদিনার পথে রওয়ানা দেন। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন আনফাল ৮:৩০, সূরা ইয়াসীন ৩৬:০৯, আত-তাওবা ০৯:৪০)

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

গুহায় তাঁরা তিন দিন অবস্থান করার পর মদিনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথ ছিল দীর্ঘ ও দুর্গম। সূর্য ছিল অতীব উত্তপ্ত। ২য় দিন বিকেল বেলায় যাওয়ার পথে উম্মে মা'বাদ নামে জনৈক মহিলার বাড়ি পড়ে। মহানবি (সা.) উক্ত মহিলার নিকট খাবার ও পানি চাইলে মহিলা একটি স্ত্রী ছাগলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং ঘরে কোনো খাবার নেই বলে উল্লেখ করেন। মহানবি (সা.) মহিলার অনুমতি নিয়ে বকরির স্তনের উপর তাঁর হাত মোবারক বুলিয়ে দিয়ে দুধ দোহন করেন এবং বড় পাত্র ভরে নেন। উম্মে মা'বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। উপস্থিত সবাই দুধ পান করেন এবং ক্ষুধা নিবারণ করেন। এরপর তাঁরা আবার মদিনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

মহানবি (সা.) মদিনার নিকটে কুবায় যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। কুবাবাসী মহানবি (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাদর সম্ভাষণ জানান। এখানে স্থানীয় মুসলিমদের সহযোগিতায় একটি মসজিদ স্থাপন করা হয়। মহানবি (সা.) নিজে এ মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটিই ছিল ইসলাম জগতের প্রথম মসজিদ। ১৪ দিন কুবায় অবস্থান করে মহানবি (সা.) পুনরায় মদিনা অভিমুখে রওয়ানা দেন। শুক্রবার দিনে তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন। মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দ। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। অনেক আনসার মহানবি (সা.)-কে মেহমান হিসেবে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। অনেকে উটের লাগাম টেনে ধরেন। মহানবি (সা.) -কে আনসারদের উটের লাগাম ছেড়ে দিতে বলেন। উট মসজিদে নববির স্থানে গিয়ে বসে পড়ে। নিকটেই ছিল আবু আইয়ুব আনসারির বাসস্থান। তিনি আইয়ুব আনসারির মেহমান হন। মদিনাবাসী মহানবি (সা.) -এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে মদিনার নাম 'ইয়াসরিব' হতে 'মদিনাতুন্নবি' রাখেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

মদিনায় হিজরতের গুরুত্ব

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মদিনায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। হিজরতের মাধ্যমে মহানবি (সা.) -এর মদিনায় নতুন জীবন শুরু হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. নির্যাতনের অবসান: মহানবি (সা.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করলে তাঁর এবং মুসলমানদের জীবনের অত্যাচার, নির্যাতন, পরিহাস ও নিরাশার দিনগুলোর অবসান হয়ে মুক্তভাবে ইসলামের প্রচারের পথ উন্মুক্ত হয়। তিনি আলোর দিশায় আলোকিত হয়ে সম্মান লাভ করে মদিনার প্রধান নিযুক্ত হন।

২. মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা: হিজরত ছিল মহানবি (সা.)-এর জীবন ও পথচলার মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "হিজরত মহানবি (সা.)-এর জীবনে নতুন দিগন্তের সূচনা করে এবং তা নিঃসন্দেহে মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।" এ হিজরত তার জীবনে সফলতার পথনির্দেশ হয় এবং মদিনাকে কেন্দ্র করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. আউস ও খাযরাজ গোত্রের মিলন: বনু আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ছিল বনু কায়লার বংশধর। ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাদের পূর্বপুরুষ ইয়ামেন হতে মদিনায় বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে বনু কায়লার এ দুই গোত্র বনু আউস ও বন্ধু খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। শতাব্দীব্যাপী এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। অবশেষে উভয় গোত্র একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর অধীনে মীমাংসা করতে আগ্রহী ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মীমাংসাকারী হিসেবে মদিনায় আগমন করেন। তিনি তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটিয়ে দেন এবং গোত্রীয় পরিচয় বাতিল করে দেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

৪. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন: মদিনাবাসীদের মহানবি (সা.) ধর্মের ভিত্তিতে 'আনসার' (সাহায্যকারী) উপাধি দেন। হিজরতের পর থেকে মদিনাবাসী আনসার উপাধিতে পরিচিত হয়ে উঠেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে আগত মুসলিমদের 'মুহাজির' এবং মদিনার মুসলিমদের 'আনসার' উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রত্যেক আনসারের সাথে একজন মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা হয়। মুহাজির-আনসার ভাই ভাই হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এতে ধনসম্পদ, উত্তরাধিকারিত্ব, আয়-ব্যয় ইত্যাদি সমভাবে বণ্টিত হতে থাকে। ইমানের স্বার্থে, ইসলামের স্বার্থে, আল্লাহর স্বার্থে প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই হিসেবে অনন্য মর্যাদা লাভ করে। পবিত্র কুরআনে ৩৩নং আয়াত দ্বারা মুহাজিরদের আনসারদের সম্পত্তিতে অংশ নির্ধারিত হয় এবং সূরা হাশরে ৯নং আয়াত দ্বারা আনসারদের সফলতার বিষয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে আনসারদের সম্পদে মুহাজিরদের অংশ নির্ধারণ রহিত হয়ে যায়।

৫. মহানবি (সা.) -এর মদিনা জীবনের সূচনা: হজরত মুহাম্মদ (সা.) -এর জীবনকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। যেমন- মক্কা জীবন ও মদিনা জীবন। মহানবি (সা.) -এর মক্কা জীবনে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতের বৈশিষ্ট্য একরকম এবং মদিনা জীবনে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতের বৈশিষ্ট্য একরকম। কুরআন শরিফের আয়াত নাযিলের শানে নুযুল, কুরআনের অর্থ, মর্ম বোঝার জন্য জানা জরুরি। কুরআন নাযিলের ধারাক্রম জানা থাকলে কুরআনের অর্থ বুঝতে বিভ্রান্তিতে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। হিজরতের মাধ্যমে মহানবি (সা.)-এর মদিনা জীবনের সূচনা হয়।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

৬. মহানবি (সা.)-এর স্থির সংকল্প: মহানবি (সা.) ছিলেন কঠোর সংকল্প ও দৃঢ় চিত্ততার উজ্জ্বল নিদর্শন। এজন্য কুরআনে তাঁকে উলুল আজম (স্থির প্রতিজ্ঞ) ফলে অভিহিত করা হয়েছে। নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর কর্মতৎপর জীবনে বহু সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এরূপ বিরূপ পরিস্থিতিতে সংকল্পে স্থির থেকে দৃঢ় চিত্তের সাথে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। তিনি দৃঢ়চিত্তে নিজ গন্তব্যে অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব করেননি। এতে একটি শিক্ষণীয় দিক পাওয়া যায় যে, নেক/পুণ্যের নিয়তে কোনো কাজ সম্পাদনের স্থির সংকল্প থাকলে আল্লাহ গায়েবি মদদে তাকে সাহায্য করবেন। নবুয়তপ্রাপ্তির পর থেকে হিজরত পর্যন্ত মহানবিকে বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তায়েফে মহানবির শরীর হতে পবিত্র রক্ত ঝরিয়েছে। তাঁর সাহাবিগণ নানা অত্যাচার, অনাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেকে ইমান রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন ইসলাম গ্রহণের কারণে অবর্ণনীয় শারীরিক আঘাত সহ্য করেছেন।

৭. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা: মদিনায় হিজরতের ফলে মহানবি (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন শুরু করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়- এককথায় সকল দিক হতে একজন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ নেতা। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ঘরে-বাইরে, এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে ইসলামের ধর্মকর্ম পালনের সুস্পষ্ট বিধিবিধান রয়েছে। মদিনায় মহানবি (সা.) ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন বিধান হিসেবে উপস্থাপনের সুযোগ লাভ করেন।

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

৮. মহানবি (সা.)-এর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ: মহানবি (সা.) মদিনার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল গোত্রের নিকট বিচারক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্ব দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতার ওপর সকলের পূর্ণ আস্থা আসে। মদিনায় মহানবির আগমনের ফলে মদিনার সকল গোত্রের লোক তাঁকে সংবর্ধনা দেন এবং সবাই তাঁকে 'মেহমান' হিসেবে পেতে আগ্রহী হয়। আউস ও খাযরাজ গোত্র তাঁকে শান্তির দূত হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান বহুদিনের বিবাদ মীমাংসার ভার দেয়। ইয়াসরিববাসী মহানবিকে এত শ্রদ্ধা সম্মান করে যে, তাঁর সম্মানার্থে তাঁরা বহু দিনের পুরাতন নাম 'ইয়াসরিব' পরিবর্তন করে 'মদিনাতুন্নবি বা নবির শহর' নামকরণ করে। সেই সময় হতে আজ অবধি ইয়াসরিব মদিনাতুন্নবি বা মদিনা বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

৯. হিজরি সাল গণনা: হিজরতের ১৭ বছর পর ২য় খলিফা হযরত ওমর (রা.) আরবি মাস গণনার একটি আলাদা বর্ষপঞ্জির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অনেকে মহানবির জন্ম বছর থেকে, অনেকে মহানবির ওফাতের বছর থেকে এবং অনেকে মহানবির মদিনায় হিজরতের বছর থেকে আরবি মাস গণনার প্রস্তাব দেন। বিভিন্ন শলাপরামর্শ ও আলোচনা শেষে মহানবির হিজরতের বছর অর্থাৎ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ হতে আরবি বছর গণনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের পিছনে যে যুক্তি তুলে ধরা হয় তা হলো- মহানবির হিজরত ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং মুসলিম বিশ্বে অধিক আলোচিত ও প্রচারিত। জামিন

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

১০. ভ্রাতৃত্ব স্থাপন : মক্কাবাসী যখন মহানবি (সা.) তথা ইসলামের গুরুত্ব না বুঝে ইসলামের কণ্ঠরোধ করতে চাইল, তখন মদিনাবাসী তথা আনসাররা মহানবি (সা.) ও ইসলামকে মদিনায় ঠাঁই দেয়। মহানবি (সা.) কর্তৃক মুহাজিরদের সাথে আনসারদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়ার পর আনসাররা বিষয়-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা সবকিছু মুহাজির ভাইকে ভাগ করে দেয়। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা পবিত্র কুরআনে এবং হাদিসের বহু জায়গায় এসেছে। সূরা হাশরের ৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, "আর তাদের জন্যও মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে (মদিনায়) বসবাস করছে ও ইমান এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে। সেজন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, আর যারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও মনের কার্পণ্য থেকে যাদের মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" সূরা তাওবাহর ১০০নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক আনসারদের প্রতি সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। মহানবি (সা.) আনসারদের সম্পর্কে বলেন, “আনসারকে ভালোবাসা ইমানের লক্ষণ, আর আনসারকে ঘৃণা করা নিফাকের লক্ষণ।”

হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব

মুহাম্মদ (স.) এর মদিনায় হিজরত

১১. মদিনার মর্যাদাবৃদ্ধি: মহানবির (সা.) হিজরতের ফলে মদিনার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর নেক বান্দাদের জন্য মদিনা নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। মুসলিমদের জন্য তা পরিণত হয় দুর্ভেদ্য দুর্গে, আর গোটা বিশ্ববাসীর জন্য তা হয়ে ওঠে হিদায়েতের আশ্রয়স্থল। মদিনার ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মহানবির হিজরতের ফলেই মদিনা শরিফে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে যায়। হিজরত মহানবি (সা.)-এর জীবনকে ও ইসলামকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে। হিজরতের ফলে পবিত্র কুরআন শরিফের সুরাগুলোও দুই ভাগে বিভক্ত। হিজরতের সাথে মক্কা অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং মদিনা অধ্যায়ের সূচনা এবং হিজরত মহানবির জীবনের একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক – ০৩ মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক ০৩ - মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

মদিনা সনদ

মদিনা সনদের পরিচয়: শাব্দিক অর্থে মদিনায় যে সনদ লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাই-ই মদিনা সনদ। পারিভাষিক অর্থে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) হিজরত করার পর মদিনার মুহাজির, আনসার, ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও মাওয়ালিদের নিয়ে ভবিষ্যৎ পথ চলার দিক নির্দেশনামূলক যে লিখিত বিবরণ তৈরি করেন, তাকে মদিনা সনদ বলে। এ সনদে ৪৭টি, মতান্তরে ৫৩টি ধারা লিপিবদ্ধ করা হয়।

মদিনার বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (সা.) এ সনদ প্রণয়ন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবদের তীব্র আবেগের বিপরীতে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। তাছাড়া মুসলিম-অমুসলিম সকলে জাতীয়ভাবে কীভাবে জীবনযাপন করা যায় তার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি মদিনায় মুসলিম, ইহুদি, পৌত্তলিক ও খ্রিষ্টানদের জন্য একটি সনদ তৈরি করেন। এ সনদ বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সনদ বা সংবিধান হিসেবে ঐতিহাসিকগণ একমত পোষণ করেছেন।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

মদিনা সনদের মুখবন্ধ ও ধারাসমূহ: বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের সিরাত গ্রন্থ অনুসারে নিচে মদিনা সনদের মুখবন্ধ ও প্রধান প্রধান ধারাগুলো দেওয়া হলো-

"দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে সনদের মুখবন্ধ।"

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক লিখিত এ চুক্তিপত্র কুরাইশ ও ইয়াসরিবের (মদিনার) বিশ্বাসী ও মুসলমানদের জন্য এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করবে, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে (মাওয়ালি যারা) এবং যারা তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, তাদের জন্য প্রদত্ত...।

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সকলে মিলে সকল জাতি থেকে আলাদা একটি সাধারণ জাতি বা উম্মাহ গঠন করবে।

২. এ সনদের আওতাভুক্ত সকল জাতির জন্য মদিনাকে পবিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

৩. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলিম, ইহুদি, নাসারা ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমান ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৪. মহানবি (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান বিবেচিত হবেন এবং তিনি সর্বময় বিচারিক ক্ষমতা লাভ করবেন।

৫. সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সকলে মিলে তা প্রতিহত করবে।

৬. মদিনা নগরি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় সমবেত শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে এবং যুদ্ধের খরচ নিজেরা বহন করবে।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

৭. ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য ব্যক্তিই দায়ী হবেন এজন্য পুরো সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।
৮. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সকল প্রকার পাপকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।
৯. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে।
১০. অতীতের মতো হত্যাকাণ্ডের জন্য দিয়ত বা রক্তপণ নীতি বহাল থাকবে।
১১. কুরাইশ ও তাদের সাহায্যদাতাদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না এবং সহযোগিতা করা যাবে না।
১২. কেউ কুরাইশ বা অন্য কোনো বহিঃশত্রুর সাথে গোপনে সন্ধি করতে পারবে না এবং মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না।
১৩. একজন মুসলমান কোনো অমুসলমানের জন্য মুসলমানকে হত্যা করবে না বা কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো অমুসলমানকে সাহায্য দানও করবে না।
১৪. মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
১৫. ইহুদিগণ তাদের নিজের খরচ বহন করবে এবং মুসলমানেরা তাদের নিজেদের খরচ বহন করবে। এ দলিলভুক্ত (সনদভুক্ত) জাতির বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে এদের উভয়ে উভয়কে সাহায্য করবে।
১৬. আশ্রিত প্রতিবেশী যতক্ষণ কোনো ক্ষতি না করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ততক্ষণ সে তারই (আশ্রয়দাতার) সমকক্ষ।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

১৭. তার লোকের সম্মতি ছাড়া কোনো মহিলাকে প্রতিবেশীসুলভ আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

১৮. এ সনদভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা বা বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তা আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি সোপর্দ করতে হবে।

১৯. অবশ্যই কোনো ব্যক্তি তার মিত্রের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না এবং মজলুমের পাশে থাকবে।

২০. সনদের শর্তভঙ্গকারীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সনদ ছিল মহানবি (সা.)-এর দূরদর্শিতার ফসল। নিচে এ সনদের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো-

১. প্রথম লিখিত সংবিধান: পৃথিবীর ইতিহাসে মদিনা সনদ সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। ইতোপূর্বে বিশ্বের কোথাও অনুরূপ লিপিবদ্ধ কোনো সংবিধান বা আইনের শাসন ছিল না। তখন শাসকদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। পক্ষান্তরে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রণীত মদিনা সনদ সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। এ সনদের মাধ্যমে রাসুল (সা.) সব জাতি-ধর্মের মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি বলেন, "এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।" আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এটিকে 'The First Written Constitution' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। অনেকে এটিকে আরবের ম্যাগনাকার্টাও বলে থাকেন।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

২. নতুন রাষ্ট্র গঠন: নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলো এককভাবে বা গোত্রীয়ভাবে মেটানো সম্ভব নয়। এজন্য মহানবি (সা.) সর্বপ্রথম জনগণের মঙ্গলার্থে একটি রাষ্ট্র গঠন করেন। রাষ্ট্রীয় শাসনে সকল সম্প্রদায় ও জনগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতার ফলে মদিনা সনদ রচিত হয়। এ সনদে নাগরিক সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকায় এ সনদকে ঐতিহাসিকগণ মহাসনদ (ম্যাগনাকার্টা) নামে আখ্যায়িত করেছেন। মদিনায় মহানবি (সা.) -এর হিজরতের পূর্বে কেন্দ্রীয় কোনো সংগঠন ছিল না। তারা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিল না। মদিনাবাসী নিজ নিজ গোত্রের প্রতি সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য দেখাত। কোনো গোত্রের একজন সদস্য অত্যাচারিত বা অত্যাচারী হলে তা গোটা গোত্রের ওপর বর্তানোর রেওয়াজ ছিল। মহানবি (সা.) পুরাতন প্রথা ভেঙে দিয়ে মদিনাবাসীদের একটি জাতি হিসেবে ঘোষণা দেন এবং ব্যক্তিগত অপরাধকে ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই গণ্য করার দ্ব্যর্থ ঘোষণা করেন।

মহানবি (সা.) সর্বসম্মতিক্রমে মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মনোনীত হন। যেকোনো সংকটকালে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত নির্দেশ গ্রহণ করা হবে মর্মে অঙ্গীকার করা হয়। সকল গোত্রের সদস্য নিয়ে একটি সাধারণ জাতি ঘোষিত হলেও গোত্রীয় প্রাধান্য বিলুপ্ত করা হয়নি। একটি গোত্রের অভ্যন্তরীণ বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে গোত্রীয় প্রধান বা শেখকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মদিনার গোত্রগুলো মদিনা রাষ্ট্রের ছোট ছোট প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে কাজ করত। সকল গোত্রের ওপর নির্বাহী ক্ষমতা ছিল বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

৩. জাতীয় সংহতি মদিনা সনদ মদিনার সমাজব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। হিজরত পূর্বে মদিনাবাসী গোত্রের প্রতি সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য দেখান। মদিনা সনদের মাধ্যমে গোত্রীয় আনুগত্যকে জাতীয় আনুগত্যের অধীন নিয়ে আসা হয়। গোত্রীয় আনুগত্য ও জাতীয় আনুগত্যের মধ্যে কখনো সংঘর্ষ দেখা দিলে জাতীয় আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মদিনা সনদ ছিল তৎকালীন মদিনাবাসীর জন্য মুক্তির সনদ। গোত্রে গোত্রে হানাহানির জন্য স্ব-স্ব ধর্ম পালন করা মদিনাবাসীদের জন্য সমস্যা হতো। মদিনা সনদে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। বলা হয়েছে যে, ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিম ধর্ম। প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। আইয়্যামে জাহিলিয়া থেকে আরববাসীদের মধ্যে একটি কুপ্রথা ছিল কোনো গোত্রের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তার দায়-দায়িত্ব ছিল গোটা গোত্রের। এজন্য সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো এবং তা যুগ যুগ ধরে চলত। ঘোড়ার পানি খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আরব গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহানবি (সা.) -এর ভয়াবহ দিক সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং মদিনা সনদে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হতে ব্যক্তি অপরাধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর বর্তাবে। শুধু ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার কারণে পরিবার বা গোত্রকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। এতে সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

৪. আইনের শাসন: মদিনা সনদ রচিত হওয়ার পূর্বে মদিনা শাসিত হয়েছে গোত্রপতিদের দ্বারা। মদিনা সনদের ধারা মোতাবেক মদিনা শাসনের ভার ন্যস্ত হয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর ওপর। তিনি পবিত্র কুরআনের বিধান মোতাবেক প্রশাসন পরিচালনা করেন। ইসলামি গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো আইনের শাসন এবং পক্ষপাতমুক্ত শাসন। ইসলাম সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা শিক্ষা দেয়। ইসলামের এ রাষ্ট্রীয় রূপ পরবর্তী মুসলিমদের জন্য অনুকরণীয় ও আদর্শ হয়ে ওঠে। P.K. Hitti এ প্রসঙ্গে বলেন, "Out of the Religious Community of Medina the later and larger state of Islam arose." অর্থাৎ মদিনা রাষ্ট্রই পরবর্তীতে বিশাল ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।

৫. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবি (সা.) মক্কায় মহানবি (সা.) ইসলাম প্রচার করেছেন এককভাবে গোপনে। পরবর্তীতে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন। এজন্য ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে। মদিনা সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে মহানবি (সা.) এমন একটি নিরাপত্তা বলয়ে প্রবেশ করেন, যেখানে মহানবি (সা.) শুধু একজন ব্যক্তি নয়, তিনি একজন রাষ্ট্রপ্রধান। মহানবি (সা.)-কে আক্রমণ করা মানে মদিনা রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা। মদিনা সনদের মাধ্যমে গোটা মদিনা শেষনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পাশে এসে দাঁড়ায়।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

৬. পরিপূর্ণ আদর্শবান হিসেবে মহানবি (সা.) মহানবি (সা.) ছিলেন পরিপূর্ণ আদর্শবান ব্যক্তি। তিনি সর্বকালের সর্বযুগের শেষ নবি ও রাসুল। ইসলাম মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনকে স্বীকৃতি দেয়। যেহেতু মানবজীবনের সকল সদগুণের সমাহার তাঁর মধ্যে রয়েছে। সে হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ড হতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। তিনি তাঁর স্বর্গীয় সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব দিয়ে ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিম সম্প্রদায়কে একই নেতৃত্বের ছায়াতলে এনেছিলেন। মদিনা সনদ ছিল সকল সম্প্রদায়কে এগিয়ে নেওয়ার একটি গাইড লাইন। তৎকালীন মদিনার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, মহানবি (সা.) মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক ওহি প্রাপ্ত বলেই এরূপ অবস্থায় একটি নতুন রাষ্ট্র রূপদান করতে পেরেছেন। ধর্মীয় এবং ভাষা ও কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকা সত্ত্বেও একটি জাতি গঠন সম্ভব, মদিনাবাসীদের কল্পনাতেও ছিল না। মহানবি (সা.) অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে মদিনা সনদে ধারা সংযোজন করেছেন। এতে সমতাভিত্তিক শাসন, সুশাসন, রাষ্ট্রদ্রোহের সংজ্ঞা ইত্যাদি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মদিনা সনদের ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সনদে মহানবি (সা.) -এর মর্যাদা, শাসক, বিচারক, সৈন্য পরিচালক ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত ছিল।

মুখবন্ধেই বলা হয়েছে- এ সনদ মহানবি (সা.) -এর পক্ষ হতে প্রদত্ত। মদিনায় হিজরত করার পর আউস ও খাযরাজ গোত্রের দীর্ঘদিনের বিবাদ মহানবি (সা.) -এর মধ্যস্থতায় চিরস্থায়ীভাবে মীমাংসা হয়। আনসারগণ মহানবিকে তাঁদের মধ্যমণি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এরপর সনদ স্বাক্ষরিত হলে সনদ বলে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

৭. বিচারক হিসেবে মহানবি (সা.) বিচারের ক্ষেত্রেও মহানবি (সা.)-কে প্রধান ও সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহর নির্দেশিত পথে বিচারের রায় ঘোষণা করবেন। এছাড়া মুক্তিপণের ক্ষেত্রে বা কেউ রাষ্ট্রদ্রোহী হলে কী করতে হবে, এমন ক্ষেত্রে মহানবি (সা.) -এর রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। অপ্রত্যাশিত কিংবা অনুল্লিখিত বিষয়েও মহানবির রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে মর্মে ঘোষণা দেওয়া হয়।

৮. সেনাপতি হিসেবে মহানবি (সা.) মদিনা সনদে প্রধান সেনাপতি হিসেবেও মহানবি (সা.) -এর মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সদস্য বা গোত্র কোনো যুদ্ধে গমন করতে পারবে না, কারও সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রধান সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দেওয়া, চুক্তি বা সমঝোতা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহানবির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মান্য কর।" এরূপ নির্দেশনা পবিত্র কুরআনে ৪০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। মদিনা সনদে মহানবি (সা.) -এর মর্যাদা, নির্দেশনা ও ধারা সংযোজন-বিয়োজন বিষয়ে যা অস্পষ্ট ছিল, তা স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় মদিনা ভূখণ্ডে মহানবি (সা.)-এর সর্বময় ক্ষমতা ও মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে।

মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

৯. নাগরিক হিসেবে সমান মর্যাদা: মদিনা সনদের ধারাসমূহ এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে মহানবি (সা.) -এর কর্মকাণ্ড আবেগমুক্তভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে নিচের কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। মদিনা সনদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মদিনা সনদে স্বাক্ষরিত সকল গোত্র ও তাদের অনুসারিগণ (মাওয়ালি) সমান নাগরিক মর্যাদা ভোগ করবে এবং আইনের চোখে সবাই সমান হিসেবে গণ্য হবে। এতে বাদী বা বিবাদীর ধর্ম, গোত্র, বর্ণ পরিচয় যাই-ই হোক না কেন। কর্মসংস্থান নাগরিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। আবার সনদে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত অপরাধ ব্যক্তিগত হিসেবেই গণ্য করতে হবে। এর জন্য গোত্রকে দায়ী করা যাবে না। মদিনা সনদ বলবৎ থাকাকালীন কোনো নাগরিক আইনের চোখে উঁচু-নীচু হয়নি, কারও ন্যায্য নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়নি। ব্যক্তি মুহাম্মদ, নবি ও রাসুল মুহাম্মদ এবং রাষ্ট্রপ্রধান মুহাম্মদ (সা.)-কে বিচার-বিশ্লেষণ করেই ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিম ও পৌত্তলিক সম্প্রদায় তাঁকে সমর্থন দিয়েছিল। ইহুদিদের অংশগ্রহণকে মজার বিষয় বলে উল্লেখ করে জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "Jews were constitutional partners in the making of the first Islamic state." Wikipedia-তে বলা হয়েছে, "The constitution of Medina establishes the importance of consent and co-operation for governance."

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক – ০৪ বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক – ০৪ বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ এবং একটি মাইলফলক। মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ (১৭ রমজান, ২য় হিজরি) বদর প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা ইসলামের ইতিহাসে 'গাজওয়ায়ে বদর' বা বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের ওপর মুসলিমদের সাহস, উদ্দীপনা ও ইমানী শক্তিনির্ভর করেছিল। বদরের যুদ্ধ ছিল সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের আক্রমণ, সত্যের ওপর মিথ্যার আক্রমণ। বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে কোনটি অন্ধকার এবং কোনটি আলো, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। দ্বীন ইসলাম ও কুফরের মধ্যে বদরের যুদ্ধ প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মুখ যুদ্ধ। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মর্যাদা মহানবি (সা.) ও আল্লাহ পাকের নিকট বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

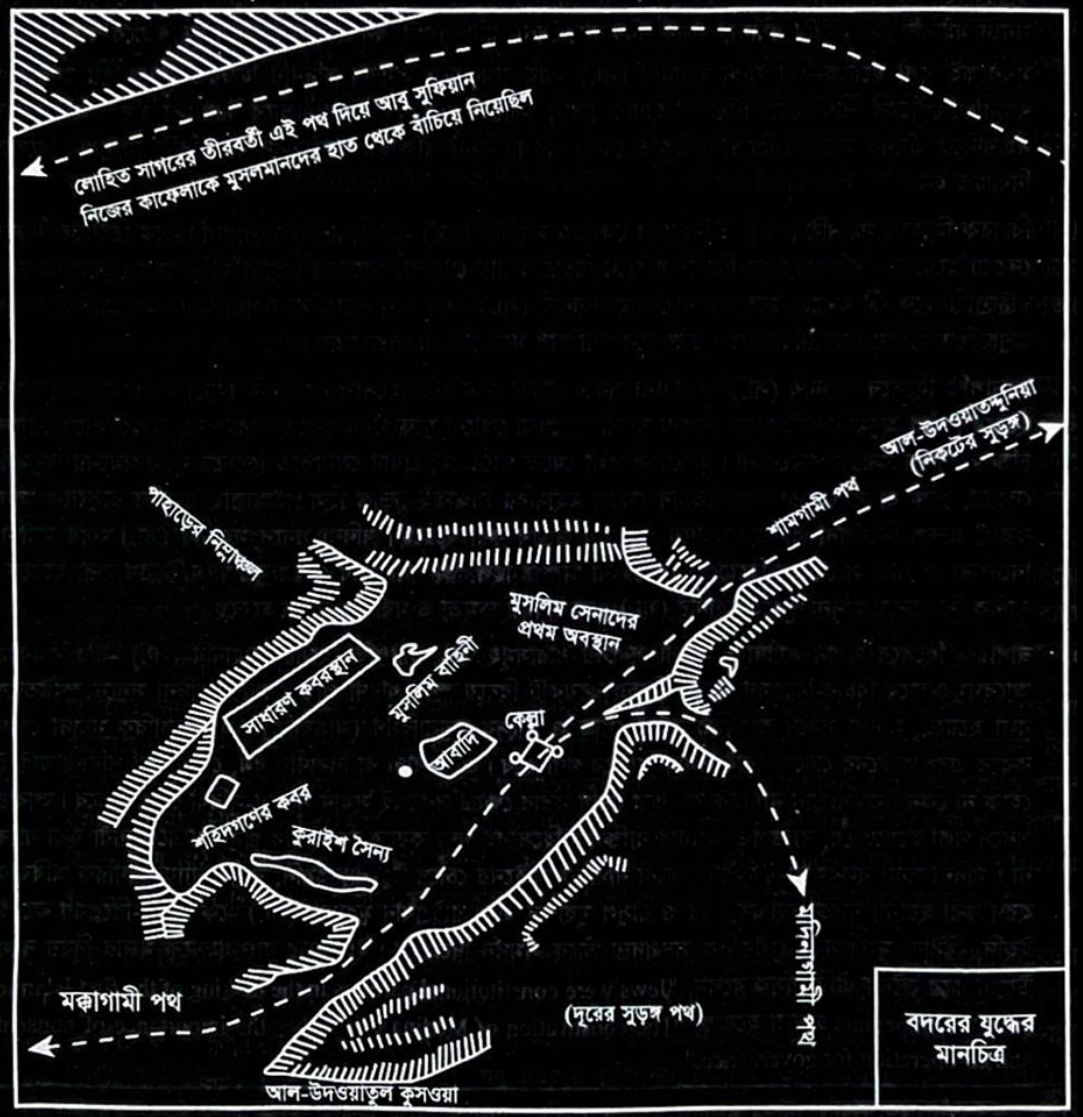

বদর যুদ্ধের মানচিত্র

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

১. মক্কাবাসীর শত্রুতা: মহানবি (সা.) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার পর হতে মক্কাবাসীদের টনক নড়ে এবং তখন হতে তারা আল-আমিন মুহাম্মদ (সা.) -এর বিপক্ষে শত্রুতা শুরু করে। বহুভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর ওপর অত্যাচার, হুমকি দেওয়া হয়। হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে মক্কার কুরাইশরা মহানবি (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হয়। মহানবি (সা.) মদিনায় হিজরত করে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ লাভ করলে এবং মদিনায় দ্রুত ইসলামের প্রসার হলে মক্কায় কুরাইশরা ঈর্ষান্বিত হয়ে মদিনা আক্রমণ করলে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২. ইহুদি গোত্রের ষড়যন্ত্র: বনু কুরাইজা, বনু কাইনুকা ও বনু নাজির ছিল মদিনার প্রভাবশালী তিন ইহুদি গোত্র। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারাই মদিনাবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের ফলে আউস ও খাযরাজ গোত্রের বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। মহানবি (সা.) হিজরত করে মদিনা আসার ফলে আউস ও খাযরাজ গোত্রের বিবাদ মিটে যায়। এছাড়া দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে তারা অনেকটা বাধ্য হয়ে মদিনা সনদে স্বাক্ষর করে। মদিনায় ইহুদিরা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা ইসলামের ক্ষতিসাধনে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এক পর্যায়ে তারা মদিনা সনদের শর্তভঙ্গ করে মক্কার কাফিরদের কাছে তথ্য পাচার করে এবং তাদের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করতে থাকে।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মোনাফেকি আব্দুল্লাহ বিন উবাই ছিলেন একজন মুনাফিক নেতা। তিনি মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান হতে চেয়েছিলেন। সকল মদিনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের শাসনব্যবস্থা ও ইসলামের আদর্শ তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেননি। তিনি মহানবি (সা.) কে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন এবং ইসলামকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করতেন। তার প্ররোচনায় কাফিররা মদিনা আক্রমণ করলে বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

৪. মহানবি (সা.)-এর নেতৃত্বকে হিংসা: মক্কার কুরাইশরা ছিল ইসলামের প্রধান শত্রু। তারা ইসলামের সূচনা হতে এর বিরোধিতা করতে থাকে। ইসলাম ধর্মের প্রতি মহান আল্লাহ পাকের গায়েবি মদদ থাকায় তা ব্যর্থ হতে থাকে। সবশেষে তারা দারুল নাদওয়ার বৈঠকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেয়। এতেও তারা ব্যর্থ হয়। সবশেষে তারা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেয়।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

৫. বাণিজ্য সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা: মক্কা নগরীতে পবিত্র কাবাঘর অবস্থিত। জাহিলিয়া যুগেও হজ মৌসুমে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে লোকজন মক্কায় জড়ো হতো। মক্কার প্রতি নির্ভরতা থাকায় আরব পৌত্তলিকদের প্রতি কুরাইশদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। কুরাইশরা তাদের সমর্থকদের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে মদিনার মুসলিমদের ধনসম্পদ লুঠতরাজ করত। মক্কা ছিল মদিনার তুলনায় অনুর্বর। মক্কায় কৃষিকাজ তেমন হতো না। এজন্য মক্কার অর্থনীতি বাণিজ্যনির্ভর ছিল। মক্কার লোকেরা মদিনার উপকণ্ঠ দিয়ে সিরিয়া বা অন্যান্য দেশে যাতায়াত করত। মদিনায় মহানবির হিজরত করার ফলে মদিনার সাথে মক্কার সম্পর্কের অবনতি হয়। বাণিজ্য পথে শত্রুর উপস্থিতি দূর করার জন্য মক্কার কুরাইশরা ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

৬. শিশু ইসলামকে ধ্বংস: ইসলামের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে কুরাইশরা ভীত হয়ে পড়ে। ফলে তারা সূচনাতেই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের আয়োজন করে। কৃষিকাজের জন্য মক্কা তুলনামূলক অনুর্বর হওয়ার কারণে মক্কার লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের ওপর নির্ভর করত। মক্কাবাসীদের ধারণা ছিল যে, মদিনায় মুসলিমদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে মদিনার মধ্য দিয়ে তাদের বাণিজ্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা যেকোনোভাবে ইসলামের গতিপথ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

৭. কুরাইশদের সমগ্র আরবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা: কুরাইশদের দ্বারা ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে এ সংবাদ গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়বে। এতে কুরাইশদের মান-সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। শত্রুদের মনে কুরাইশদের ব্যাপারে ভীতি বদ্ধমূল হয়ে পড়বে। এরূপ অলীক চিন্তাভাবনায় আবু জেহেল বদর নামক প্রান্তরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। মক্কার কুরাইশরা গোটা আরবের প্রধানরূপে গণ্য হতো এবং তারাই ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের প্রধান শত্রু। তাদের পরাজিত করার অর্থ ছিল গোটা আরবকে পরাজিত করার শামিল। মক্কা ছাড়া অন্যান্য আরববাসী ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো। তাই মক্কাবাসী মদিনাবাসীকে পরাজিত করার দুরাশা করে।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

৮. আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার: কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বাণিজ্যের অজুহাতে মদিনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে সমরাস্ত্র সংগ্রহের জন্য সিরিয়া যান। গাজা থেকে আসা এ কাফেলায় প্রায় ৫০,০০০ দিনার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসামগ্রী ছিল। নাখলার যুদ্ধে বিপর্যস্ত কুরাইশরা মক্কায় কাফেলার নিরাপদে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এ সময় গুজব রটে, মক্কায় ফেরার পথে কুরাইশদের কাফেলায় মদিনার মুসলমানরা হামলা করেছে। খবরের সত্যতা যাচাই না করেই কুরাইশরা আবু জেহেলের নেতৃত্বে প্রায় ১০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করে।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

৯. নাখলার খণ্ডযুদ্ধ: মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি স্থানের নাম ছিল নাখলা। মক্কার কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারী গোত্রসমূহ প্রায়ই মদিনার উপকণ্ঠে শস্যখেত জ্বালিয়ে দিত, ফলবান বৃক্ষ নষ্ট করত এবং উট, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি অপহরণ করে নিয়ে যেত। মহানবি (সা.) মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী গোত্রসমূহের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি গোয়েন্দা দল সীমান্তবর্তী এলাকা টহল দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। টহলদার বাহিনীর সাথে কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আমর নিহত ও অপর দুই ব্যক্তি বন্দি হয়। নাখলা নামক স্থানে এ সংঘর্ষ হয় রজব মাসের ১ম রাতে। আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ মনে করেছিলেন তারিখটি ছিল জুমাদাস সামি মাসের শেষ দিন। রজব, যিলকদ, যিলহজ ও মুহাররম এ চার মাস ছিল নিষিদ্ধ মাস। কাফেররা বলতে শুরু করে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারী আল্লাহর অনুগত বলে দাবি করে অথচ হারাম নিষিদ্ধ মাসে মানুষ খুন করে। তখন আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় ২১৭নং আয়াতে নাখলার খণ্ডযুদ্ধের ব্যাখ্যা করেন। এ নাখলার যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

১০. আল্লাহর আদেশ: কুরাইশদের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে মহানবি (সা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি আল্লাহর আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় আল্লাহ ইরশাদ করেন- "তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। কারণ সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না (আল-কুরআন সূরা বাকারা: ১৯০)।" অতঃপর মহানবি (সা.) যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আলে ইমরান আয়াত ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৬৯; সূরা আল বাকারা আয়াত ১৫৪; মুসলিম শরিফ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৩ ও ১৩৯ দ্রষ্টব্য)

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের কারণ

বদর একটি কুয়ার নাম। গিফার গোত্রের বদর নামক এক ব্যক্তি কুয়াটি খনন করেন। তার নামানুসারে ওই কূপের নাম রাখা হয় বদর। কারও মতে খননকারীর নাম বদর ইবন কুরাইশ ইবন ইয়াখলাদ। কেউ কেউ বলেন, জনৈক ব্যক্তির বদর অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্রাকৃতির একটি কুয়া ছিল। তাই একে বদর বলা হয়। মদিনা হতে এর দূরত্ব চারদিনের পথ। আধুনিক হিসাবমতে, মদিনা হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৮০ মাইল বা ১৩০ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত। এ সময় হতে 'বদর' ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে ওঠে। বদর উপত্যকার পাদদেশের আল আরিশ পাহাড়ে মুসলিম পক্ষ অবস্থান নেয় এবং কুরাইশরা আকানকুল টিলার পিছনে অবস্থান নেয়। মুসলিমদের পক্ষে ৩১৩ জন এবং কুরাইশদের পক্ষে ১০০০ জন সৈন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম পক্ষে সেনাপতি ছিলেন বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরাইশ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন আবু জেহেল। তৎকালীন আরবের রেওয়াজ মোতাবেক হযরত উবায়দা উতবার সাথে, হযরত হামজা শায়বার সাথে এবং হযরত আলী ওয়ালিদের সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। শত্রুপক্ষের ১ম দুইজন নিহত হয়। এরপর শুরু হয় মুসলিম বাহিনীর সাথে কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি সম্মুখযুদ্ধ। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং কুরাইশদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়। অপরদিকে ২৪ জন মুসলমান শহিদ হন। যার মধ্যে আনসার ৮ জন ও মুহাজির ৬ জন।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

প্রথম সামরিক বিজয়: ১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে বদর প্রান্তরে বিধর্মী ও মুসলিমদের মধ্যে যে অসম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। মাত্র ৩১৩ জন সাহাবি নিয়ে ১০০০ জন সৈন্যের মোকাবিলা করা এবং ইসলামের প্রথম সামরিক অভিযান হিসেবে এর ফলাফল ঐতিহাসিকদের নিকট যেমন গবেষণার বিষয়, তেমনি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের ইতিবৃত্তের শুধু একটি বিখ্যাত যুদ্ধই নয়, এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। যোসেফ হেল বলেন, “বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বড় ধরনের সামরিক বিজয়।"

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

৫. মক্কাবাসীর অহমিকা চূর্ণ: মক্কাবাসী ৬২৪ সালের ১৭ মার্চের আগে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর তাদের সে অহমিকা চূর্ণ হয়ে যায়। তাদের সকল কলাকৌশল, সামরিক অহমিকা কোনো কাজেই আসেনি। এ যুদ্ধে কুরাইশদের ৭০ জন সৈন্য নিহত হয় এবং সমসংখ্যক সৈন্য বন্দী হয়।

৬. ইসলামের প্রচার ও প্রসার: বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় গোটা আরববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। অনেক অমুসলিম বদর যুদ্ধের বিজয়কে স্বর্গীয় হিসেবে চিহ্নিত করে এবং দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে আসে। মদিনায় বসবাসরত আহলে কিতাব ও পৌত্তলিকগণ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে আসতে থাকে। যোসেফ হেল বলেন, “এ বিজয়ের ফলে মদিনাবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।" নিকলসন বলেন, "এ যুদ্ধে বিজয়ের কারণে সকলের দৃষ্টি মহানবি (সা.) -এর ওপর নিবদ্ধ হয়। দ্বীন ইসলামের ওপর আরব জনগণের আগ্রহ বেড়ে যায়।"

৭. বিধর্মীদের আতঙ্ক: মুসলিমদের বদর বিজয় ইসলামের সামরিক শক্তির পরিচায়ক। আরবে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, ইসলাম পুনর্জাগরণ লাভ করল এবং আত্মরক্ষার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করল।" প্রকাশ্যে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে বিধর্মীরা বাধা দেওয়ার প্রবল মনোবলে চিড় ধরে।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

৮. অর্থনৈতিক উন্নতি: বদরের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। গনিমতের মাল হিসেবে ১৫০টি উট এবং ১০টি অশ্ব লাভ করে। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য লাভ করে। ৭০ জন যুদ্ধ বন্দিকে ৪০০০ দিরহাম মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। যারা মুক্তিপণ দিতে পারেনি তাদের শ্রমের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

৯. বিশ্ববি জয়ের সূচনা: বদরের যুদ্ধ বিজয়ের ফলে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ বিজয় ইসলামের প্রথম সামরিক বিজয়। ফলে মুসলমানদের মনে নতুন উদ্দীপনা, সাহস ও শক্তি পায়। গোটা বিশ্ব বিজয়ের সূত্রপাত হয়। P.K. Hitti বলেন, "The Battle of Badar laid the foundation of Muhammad's temporal power, Islam had won its first and decisive military victory." অর্থাৎ বদরের যুদ্ধ মহানবি (সা.)-এর পার্থিব শক্তির ভিত্তি স্থাপন করে। ইসলামে প্রথম তার সামরিক বিজয়ের সূচনা করে।১০

১০. গনিমত লাভ: বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ ইসলামের প্রথম সামরিক অভিযানে বিজয়ী হয়। এর ফলে অস্ত্রশস্ত্র যেমন লাভহয়, তেমনি ধনসম্পদও প্রাপ্ত হয়। এ গনিমতের মাল বিতরণ করতে গিয়ে আরবীয়রা বংশ তালিকা (কুলজি)-কে সমৃদ্ধ করে এবং এ তালিকা দেখে পরে প্রত্যেকের মর্যাদা নিরূপিত হয়। এক্ষেত্রে এ যুদ্ধের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে।

১১. অদৃশ্য মদদ : বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে আরবীয়রা পরস্পরকে বলাবলি করতে থাকে যে, অদৃশ্য মদদ ছাড়া মুসলিম পক্ষের বিজয় সম্ভব নয়। আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা পরস্পরকে বলতে শুরু করে যে, তারা অনেক অপরিচিত মুখকে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে দেখেছে। এসব থেকে ইসলামের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

১১. অদৃশ্য মদদ : বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে আরবীয়রা পরস্পরকে বলাবলি করতে থাকে যে, অদৃশ্য মদদ ছাড়া মুসলিম পক্ষের বিজয় সম্ভব নয়। আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা পরস্পরকে বলতে শুরু করে যে, তারা অনেক অপরিচিত মুখকে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে দেখেছে। এসব থেকে ইসলামের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

১২. যুদ্ধবন্দিদের সাথে মহৎ আচরণ: মহানবি (সা.)-এর ক্ষমা ছিল প্রকৃত বীরের ক্ষমা। দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কার বিদ্রোহীরা মহানবি (সা.) তাঁর আত্মীয়স্বজন ও তাঁর প্রিয় শিষ্যদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করেছে, অবিরত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দিয়েছে, পথেঘাটে বিদ্ররূপ করেছে। সর্বোপরি তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করে পরাজিত হয়েছে সেই পরাজিত যুদ্ধবন্দি মক্কার বিদ্রোহীদের বিষয়ে মহানবির আচরণ, ক্ষমা অতুলনীয়। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শে মহানবি (সা.) সামর্থ্য অনুযায়ী যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তিপণ ধার্য করেন। অবশিষ্টদের জন্য তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

১২. যুদ্ধবন্দিদের সাথে মহৎ আচরণ: মহানবি (সা.)-এর ক্ষমা ছিল প্রকৃত বীরের ক্ষমা। দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কার বিদ্রোহীরা মহানবি (সা.) তাঁর আত্মীয়স্বজন ও তাঁর প্রিয় শিষ্যদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করেছে, অবিরত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দিয়েছে, পথেঘাটে বিদ্রূপ করেছে। সর্বোপরি তারা সশস্ত্র সংগ্রাম করে পরাজিত হয়েছে সেই পরাজিত যুদ্ধবন্দি মক্কার বিদ্রোহীদের বিষয়ে মহানবির আচরণ, ক্ষমা অতুলনীয়। হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শে মহানবি (সা.) সামর্থ্য অনুযায়ী যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তিপণ ধার্য করেন। অবশিষ্টদের জন্য তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, বদর যুদ্ধের মাধ্যমে মদিনা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের ব্যাপারে বাস্তবতার চেয়ে মুসলিমরা বিশ্বাসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। এ যুদ্ধের ফলাফল নেতিবাচক হলে মুসলিমদের বিশ্বাস আঘাতপ্রাপ্ত হতো। মদিনার অমুসলিমরা ইসলামের মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হয়। "মদিনাবাসীর ওপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তারা আমাদেরকে উট বা ঘোড়ায় চড়তে দিয়ে নিজেরা হেঁটে চলত। তারা নিজের সামান্য রুটিও নিজেরা না খেয়ে আমাদের খেতে দিয়ে নিজেরা খুরমা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। বদর যুদ্ধের গুরুত্ব এই যে, মহানবি (সা.) নিজে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং মহান আল্লাহ পাক এ যুদ্ধ সম্পর্কে পবিত্র আয়াত নাযিল করেছেন।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক – ০৫ উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক ০৫ - উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

২১ মার্চ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উহুদ প্রান্তরে মক্কার কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হয়। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ উহুদের যুদ্ধপূর্ব এসব চিহ্নিত মুনাফিক সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ১৬৭নং আয়াতে বলেন, "তারা (মুনাফিকেরা) বলেছিল, যদি আমরা জানতাম, তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম, সেদিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে, তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা জানেন।" বদর যুদ্ধের ফলাফলে এবং কুরাইশদের ক্ষয়ক্ষতির কারণে কুরাইশরা রাগে-ক্ষোভে, অপমানে ফেটে পড়ে। বদর যুদ্ধের পরাজয়কে তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তখনো কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে সামরিক যুদ্ধে জয়ের ব্যাপারে আশা ছেড়ে দেয়নি। কুরাইশ কবিদের কাব্য ও রম্যরচনা, স্বার্থবাদী ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, নারীদের প্ররোচনা এবং প্রতিশোধপরায়ণতা পরবর্তী যুদ্ধের জন্য মুশরিকরা জোর প্রস্তুতি নিতে থাকে।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

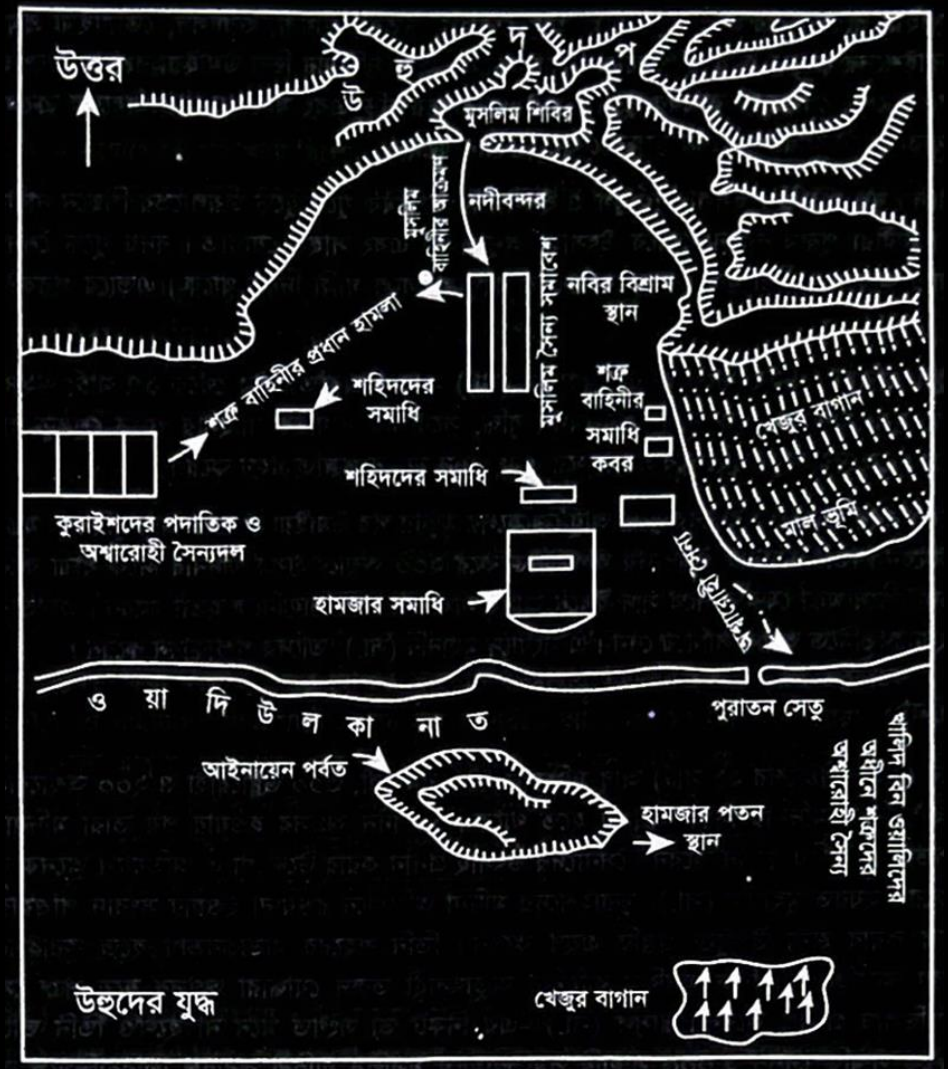

উহুদ যুদ্ধের মানচিত্র

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের কারণ

১. কবিদের কুমন্ত্রণা: ইসলাম বিরোধীরা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য কবি জাহসি ও কবি মাসামে নামক দুই জন কবি নিযুক্ত করে। তারা বদরে নিহত নেতাদের নামে মর্সিয়া, শোকগাথা ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকে। মক্কার ব্যবসায়িগণ যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার জন্য চাঁদা দেয় ও সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকে।

২. কুরাইশদের প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় বদর যুদ্ধে পরাজিত মক্কার কুরাইশরা রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা এ পরাজয়ের বদলা নেওয়ার জন্য জোর প্রস্তুতি নিতে থাকে। আবু জেহেল, উতবা, শায়বা, ওয়ালিদ প্রমুখ বদরের যুদ্ধে নিহত নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ এবং বদর প্রান্তরে কুরাইশদের অহমিকা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিশোধের নেশায় তারা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

৩. স্বার্থবাদী ইহুদিদের ষড়যন্ত্র মদিনায় বসবাসরত স্বার্থপর ইহুদিরা ছিল ষড়ন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক। তারা মদিনা সনদের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের ক্ষতিসাধনের জন্য মক্কার কুরাইশদের প্ররোচনা দিতে থাকে। ইহুদি কবি কাব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে মক্কাবাসীদের মুসলমানদের ওপর ক্ষেপিয়ে তোলে।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের কারণ

৪. হাশিম ও উমাইয়া বংশের শত্রুতা: বদর যুদ্ধে আবু জেহেল, উতবা, শায়বা, ওয়ালিদ, তোয়াইমা প্রমুখ কুরাইশদের মৃত্যু হলে কুরাইশদের নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের নিকট আসে। আবু সুফিয়ান ছিল উমাইয়া বংশের এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন হাশেম গোত্রের। বদরের যুদ্ধে উমাইয়াদের ক্ষয়ক্ষতি এবং মদিনায় হাশেমীয়দের ক্রমোন্নতির কারণে মক্কার উমাইয়ারা গোটা আরববাসীদের যুদ্ধের জোর আহ্বান করে।

৫. বিদ্রোহী নারীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি: ইসলামপূর্ব যুগ ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধে জয়লাভের পিছনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নারীরা পুরুষদের নানাভাবে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সাহস যোগাত। বদর যুদ্ধে সৈন্যাধিক্য নিয়েও পরাজয় হওয়ার কারণে নারীরা যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তিদের কাপুরুষ বলে গালি দিতে থাকে। এভাবে পরবর্তী উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা

৬. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা: ৬২২ সালে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর হিজরতের পর থেকে ১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মদিনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি, জনসমর্থন বৃদ্ধি, সর্বোপরি সামরিক বাহিনীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন মক্কাবাসী তথা কুরাইশরা নিজেদের ধিকৃত হিসেবে গ্রহণ করে এবং উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৭. আবু সুফিয়ানের বর্বর আচরণ বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলের মৃত্যুর পর উমাইয়া গোত্রের আবু সুফিয়ান মক্কার কুরাইশদের নেতৃত্ব লাভ করেন। তিনি মদিনার ইহুদিদের অপমানিত করে ২০০ অশ্বারোহীসহ মদিনার দিকে যাত্রা করেন। ইহুদিদের সাথে আলোচনা শেষে মক্কা ফেরার পথে সাদ ইবনে আমর নামক একজন সাহাবিকে হত্যা করেন। এছাড়া কয়েকটি বাড়ি লুট করে এবং চারণভূমিতে আগুন লাগিয়ে দেন। এ সংবাদে মহানবি (সা.) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা

হিজরি তৃতীয় সনে (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মার্চ) আবু সুফিয়ান ৭০০ বর্মধারী, ৩০০ উষ্ট্রারোহী ও ২০০ অশ্বারোহীসহ ৩,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১০ দিন অগ্রসর হওয়ার পর তারা মদিনার পাঁচ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় শিবির স্থাপন করেন। সৈন্যদের উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্যে এ অভিযানে অনেক নারী ও মহিলা কবি অংশগ্রহণ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশদের মদিনা অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি শহরের অভ্যন্তরভাগ হতে কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর অত্যুৎসাহী তরুণ যোদ্ধারা অগ্রসর হয়ে শত্রু সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। রাসূল (সা.) -এর নিকট তা সংগত মনে না হলেও তিনি তাদের বার বার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সম্মতি দেন। ১,০০০ সাহাবি সমভিব্যহারে মুসলিম বাহিনী কুরাইশ শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হলো। পথিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার ৩০০ অনুচর নিয়ে মুসলিম বাহিনী হতে সরে দাঁড়াল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) অগত্যা তাঁর অবশিষ্ট ৭০০ সাহাবি নিয়ে কুরাইশদের সম্মুখীন হলেন।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা

সেদিন ছিল রবিবার। প্রত্যুষেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) সসৈন্যে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে বালুকাময় প্রশস্ত সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছলেন। পরবর্তী দিবস তিনি পাহাড়ের অর্ধবৃত্তাকার বক্রাংশে প্রবেশ করে তার অভ্যন্তরভাগের উপযুক্ত স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। পাহাড়ের বৃত্তাকার অংশের বহির্ভাগ থেকে তিনি যুদ্ধ চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং সেভাবে তীরন্দাজদের ৫০টি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে আইনায়েন পাহাড়ের শীর্ষদেশে মোতায়েন করেন। পশ্চাৎদেশ হতে কুরাইশরা যাতে যুদ্ধে নিয়োজিত মুসলিম বাহিনীর প্রধান অংশের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে না পারে, সেজন্য রাসুল (সা.) তীরন্দাজ বাহিনী এবং আল-যুবাইয়ের (রা.) নেতৃত্বে ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দলের ওপর উহুদ ও আইনায়েন পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

রাসুল (সা.) আইনায়েন পাহাড়ের তীরন্দাজ বাহিনীকে কোনো অবস্থাতেই তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। মুসলমানদের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়ার পর কুরাইশরা তাদের প্রধান পদাতিক বাহিনী এবং ইকারামা ১০০ সৈন্য দ্বারা গঠিত অশ্বারোহী দলের অর্ধাংশ নিয়ে সম্মুখভাগ হতে মুসলিম বাহিনীর দিকে ধাবমান হয় এবং মুসলমানদের ওপর পশ্চাৎদিক হতে আক্রমণের জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে তাদের অশ্বারোহী দলের অপর অর্ধাংশ প্রেরণ করে।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় দল সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে মুসলিম বাহিনী একের পর এক জয়লাভ করতে থাকে। এতে উৎসাহিত হয়ে মুসলিম তীরন্দাজ দল মনে করে যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তাই তারা সেনাপতির কঠোর সতর্কবাণী উপেক্ষা করে এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই স্বস্থান ত্যাগ করে গণিমত সংগ্রহে নেমে পড়ে। খালিদ এ সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি তখন তাঁর অশ্বারোহী দল নিয়ে ছত্রভঙ্গ মুসলিম সৈন্যদের ওপর পশ্চাৎদিক হতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর কোনো উপায় না দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করতে থাকে।

রাসুল (সা.) সে সময় তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। তাঁর এ দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কুরাইশ গোত্রের ইবনে কামিয়া তাঁর ওপর প্রচণ্ড বেগে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে তাঁর সম্মুখভাগের দুটি দাঁত শহিদ হয় এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রাসুল (সা.) কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সে সময় গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় যে, রাসুল (সা.) নিহত হয়েছেন।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা

উহুদের যুদ্ধে হামজাসহ (রা.) ৭০ জন মুসলিম শহিদ হন এবং অপরপক্ষে ২৩ জন শত্রুসৈন্য নিহত হয়। সে সময় উহুদ পাহাড়ের শোকবিহ্বল স্তব্ধ পরিবেশ, আবু সুফিয়ানের দুর্বিনীত স্ত্রী হিন্দা নিহত হামজার (রা.) বক্ষ চিরে তাঁর কলিজা উৎপাটন করে চর্বণ করতে থাকে। এভাবে সে বদর প্রান্তরে বীর হামজার (রা.) সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার পিতার পরাজয় ও মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এতে মুসলমান হতোদ্যম হয়ে পড়ে। হযরতের গায়ে দুটি লৌহ বর্ম ছিল। এর ওজন ও যখমের যন্ত্রণায় তিনি উপরে উঠতে পারছিলেন না। হযরত তালহা কাঁধে করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তুলে নিলেন এবং তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। এবার বিক্ষিপ্ত সাহাবাগণ আবার মহানবি (সা.) -এর চতুর্দিকে সমবেত হলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও সাহাবাগণ যারা মাঠে ছিলেন সকলে পর্বতে আরোহণ করলেন। কাফেররা পর্বতে উঠতে চেয়েও ব্যর্থ হলো। কাফির নেতা আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, মুহাম্মদ আছে কি? হযরত বললেন, চুপ থাক; আবার বললেন চুপ থাক। তখন সে চিৎকার করে বলল, মনে হয় এ তিনজনই নিহত হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) ধৈর্যচ্যুত হয়ে বলে ফেললেন, আল্লাহর রহমতে তিনজনই তোমাকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য জীবিত আছেন। তারপর আবু সুফিয়ান বলল, আগামী বছর বদরে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে আবার যুদ্ধ হবে।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ

১ . মহানবি (সা.)-এর আদেশ অমান্য: উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী তাদের নেতার আদেশ যথাযথ পালন করেনি। মহানবি (সা.)-এর নির্দেশ ছিল, জয় অথবা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ না ছাড়ে। কিন্তু বিজয় নিজেদের করায়ত্ত মনে করে মুসলিম বাহিনী নবির আদেশ লঙ্ঘন করায় তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সে সুযোগে কুরাইশরা তাদের আক্রমণ করে। নেতার আদেশ লঙ্ঘন ও শৃঙ্খলার অভাবই ছিল উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

২. খালিদের বীরত্ব: মহাবীর খালিদের রণদক্ষতা ও চাতুর্য শত্রুপক্ষের বিজয়কে সম্ভব করেছিল। মুসলিম সেনাদল যখন রণক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ত্যাগ করে গণিমতের মাল নেওয়ার জন্য ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ মুসলমানদের ওপর চরম আঘাত হানেন। তার আক্রমণে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মূলত খালিদের রণকৌশলের নিকট মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ

৩. অপপ্রচার: যুদ্ধ চলাকালে মিথ্যা গুজব রটানো হয় যে, রাসুল (সা.) শাহাদাত বরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পতাকাবাহী মুসাব ইবনে উমায়ের মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ধরাশায়ী হন। তার সাথে রাসুল (সা.) -এর সাদৃশ্য থাকায় গুজব প্রচারিত হলে ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে থাকে।

৪. আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ষড়যন্ত্র: মদিনার শাসক হওয়ার বাসনা লালনকারী মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই মহানবি (সা.) -এর শাসক হওয়া মেনে নিতে না পেরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ৩০০ সৈন্যসহ অংশগ্রহণ করেও সে পথিমধ্যে তার অনুচরসহ দলত্যাগ করলে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পায়, যা কুরাইশদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ

৫. কুরাইশদের সংখ্যাধিক্য: ৭০০ মুসলিম মুজাহিদ দল ৩,০০০ কুরাইশ বাহিনীর সাথে সংখ্যাধিক্যহেতু মোকাবিলা করতে পারেনি। মোনাফেক আবদুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ জন অনুচরসহ পলায়ন করলে মুসলিম শক্তি কিছু হ্রাস পায়।

৬. প্রতিকূল আবহাওয়া: যুদ্ধের সময় হঠাৎ করে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় মুসলিম বাহিনী শত্রু-মিত্র শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় এবং কুরাইশ বাহিনী এ সুবিধা গ্রহণ করে।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল

উহুদের যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য এক ইমানি পরীক্ষা। নিচে উহুদ যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হলো-

১. মুসলমানদের ইমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা: উহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের এক অগ্নিপরীক্ষা। উহুদ যুদ্ধের অমীমাংসিত রায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কারণ পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি ইমান ও ধৈর্য নিয়েই মোকাবিলা করেছেন।

২. মুসলমানদের বিপর্যয়: উহুদ যুদ্ধের মুসলিম বাহিনী সামরিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। উহুদ যুদ্ধে হযরত হামজা (রা.), হযরত মুসআর (রা.) সহ ৭০ জন মুজাহিদ শহিদ হন। বিদ্রোহী নারীরা মুজাহিদদের নাক ও কান দিয়ে মালা গেঁথে চরম বীভৎসতার পরিচয় দেয়। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামজা (রা.)-এর বুক চিরে কলিজা চর্বণ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুটি দন্ত মোবারক শহিদ হয়।

৩. যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত: উহুদ যুদ্ধে কোনো পক্ষই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হতে পারেনি। মুসলিম বাহিনী প্রথমে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং গনিমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে, শত্রুবাহিনী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর শাহাদাত বরণের গুজব শুনে রণে ভঙ্গ দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর আদেশ অমান্য করে বস্তুগত দ্রব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ার ফলে কীরূপ ক্ষতি হতে পারে উহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের তা চরম শিক্ষা দেয়। পরবর্তীতে মুসলমানরা আর কখনো হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর আদেশ অমান্য করেনি।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল

৪. দুই ইহুদি গোত্রকে বহিষ্কার: মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে বনু কাইনুকা ও বনু নজির গোত্রীয়. মুসলমানদের সাহায্য করার পরিবর্তে আক্রমণকারী শত্রুদের সাহায্য করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। উহুদ যুদ্ধের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) সালিসির মাধ্যমে বনু কাইনুকা ও বনু নজির গোত্রকে মদিনা থেকে বের করে দেন।

৫. মুসলমানদের চরম শিক্ষা: উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা এক চরম শিক্ষা লাভ করে। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করলে পরাজয় অবধারিত এবং সেনাপতির আদেশ অমান্য করলে গোটা বাহিনীর ওপর বিপর্যয় ডেকে আনে- এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা এ মহান শিক্ষা লাভ করে।

৬. জয়-পরাজয়ের নামান্তর: উহুদ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মিথ্যা দাবি বিদ্রোহীদের বেশিক্ষণ স্থায়ী ছিল না। দূরদর্শী সেনাপতি রাসুল (সা.) মদিনা পৌছেই একদল মুজাহিদ বাহিনী বিদ্রোহীদের ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করেন। এতে প্রমাণিত হয়, মুসলমানরা বিপর্যয়ের মুখেও পরাজিত হয়নি বরং মনোবল অটুট থাকে।

উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল

৭. বাণিজ্য পথ নিয়ন্ত্রণ: মক্কাবাসীরা মদিনার ভেতর দিয়ে সিরিয়া ও মিশরের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করত। উহুদ যুদ্ধের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কাবাসীদের জন্য মদিনাকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন। ফলে মক্কাবাসীরা বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরিশেষে উহুদের যুদ্ধ মুসলমান বাহিনীর জন্য এক চরম শিক্ষা। তারা পরবর্তী যুদ্ধগুলোর জন্য সুসংগঠিত হয় এবং সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়। কাফিররা উহুদে যুদ্ধ বিজয়ের মিথ্যা আনন্দ করলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তারা কোনো মুসলমানকে যুদ্ধবন্দি করে নিয়ে যেতে পারেনি।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক – ০৬ খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক – ০৬ খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

This Topic is important for

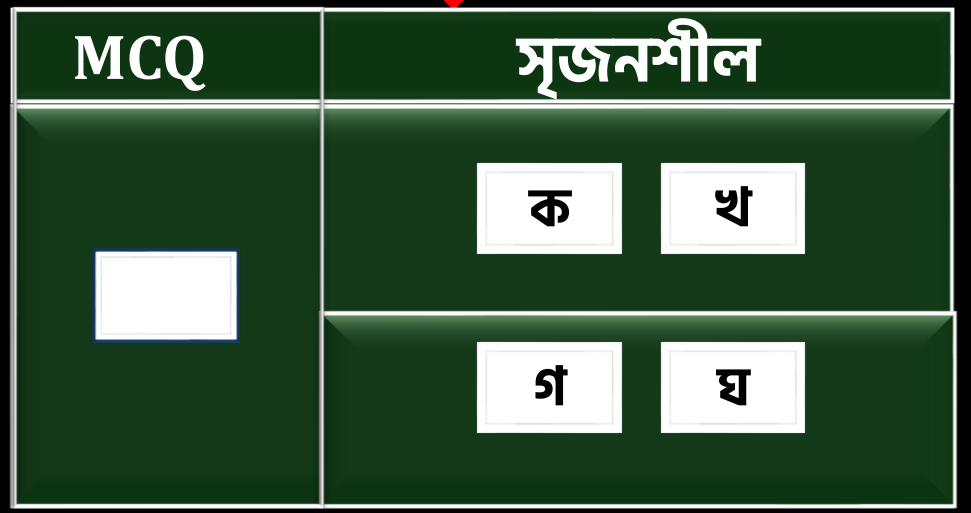

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

ইসলামকে ধ্বংস করতে না পারার ব্যর্থতা কুরাইশ তথা ইসলামের শত্রুদের মর্মপীড়ার মূল কারণ ছিল। তারা বারবার সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে কিন্তু তখন ইসলাম বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায় দাঁড়িয়ে গেছে। মূলত খন্দকের যুদ্ধ 'বনু কাইনুকা ও বনু নজির' গোত্রের কুপ্ররোচনায় হয়। ফারসি শব্দ 'কান্দ' হতে আরবি খন্দক শব্দটি এসেছে। এর অর্থ পরিখা। ৩১ মার্চ, ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের এ যুদ্ধে পরিখা খননের মাধ্যমে খোদাদ্রোহীদের মোকাবিলা করা হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। মদিনার তিন দিকে ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগান ছিল। শুধু উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক ছিল উন্মুক্ত। হযরত সালমান ফারসি (রা.) সামরিক কৌশলে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পরামর্শ ও মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তে মদিনার উন্মুক্ত দিক দশ হাত প্রস্থ ও দশ হাত গভীর এক পরিখা খনন করা হয়। এ স্থানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরিখা খননের মাধ্যমে মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বলে একে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মাজিদে এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় এ যুদ্ধকে 'Battle of the Confiderates' বা সম্মিলিত শক্তিসমূহের যুদ্ধ বলা হয়।

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা

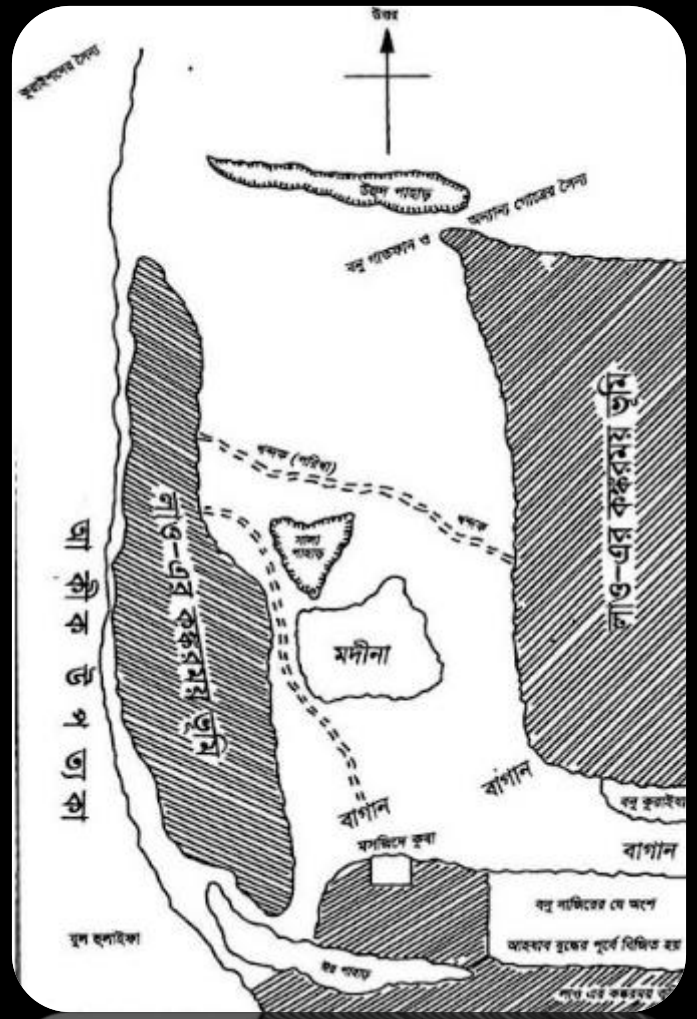

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধের কারণ

খন্দক যুদ্ধের পিছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। যেমন-

১. মদিনা রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি: উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় পরবর্তীতে মদিনা রাষ্ট্রের মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। মদিনা রাষ্ট্রের জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া ইসলামকে শক্তিশালী করে তোলে। কাফের, মুশরিক, ইহুদি ও খোদাদ্রোহীদের তা সহ্য হয়নি। এজন্য তারা পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

২. বেদুইন গোত্রসমূহের বিরোধিতা: আরবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদুইন গোত্রসমূহ প্রথমে ইসলামকে গুরুত্ব না দিলেও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে থাকে। পর পর দুটি যুদ্ধে মুসলমানদের সামরিক শক্তি দেখে বেদুইনরা মনে করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হলে তাদের লুটতরাজ বন্ধ হবে। এজন্য গাতফান, সুলাইম, আসজা, আসাদ, ফারায়া প্রভৃতি বেদুইন গোত্র কুরাইশদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করে।

৩. ইহুদিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ: বদর ও উহুদ যুদ্ধে শত্রুদের সহযোগিতা করে 'বনু কাইনুকা ও 'বনু নজির' গোত্র মদিনা সনদ মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত হয়। বিচারে তাদের নির্বাসনে দেওয়া হয়। ফলে তারা খায়বরের ওয়াদিউল কুরা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে বসতি স্থাপন করে এবং গোটা আরবের ইহুদি, মুশরিক ও পার্শ্ববর্তীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের সহায়তার ফলে কুরাইশরা দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধের কারণ

৩. ইহুদিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ: বদর ও উহুদ যুদ্ধে শত্রুদের সহযোগিতা করে 'বনু কাইনুকা ও বনু নজির' গোত্র মদিনা সনদ মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত হয়। বিচারে তাদের নির্বাসনে দেওয়া হয়। ফলে তারা খায়বরের ওয়াদিউল কুরা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে বসতি স্থাপন করে এবং গোটা আরবের ইহুদি, মুশরিক ও পার্শ্ববর্তীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের সহায়তার ফলে কুরাইশরা দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

৪. কুরাইশদের স্বার্থহানি: মক্কার আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় এবং সেখানে কোনো আবাদ না হওয়ায় কুরাইশরা সিরিয়া ও ইরাকের সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য করে জীবনধারণ করত। মক্কা থেকে সিরিয়া ও ইরাকে মদিনার পথ ধরেই যেতে হতো। মুসলমানগণ মক্কার সাথে সিরিয়া ও ইরাকের বাণিজ্য পথ ছিন্ন করে দেয়। ফলে কুরাইশদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। এ বাধা দূর করার জন্য তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

৫. মুসলিম শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করার ইচ্ছা মুসলিম শক্তির উত্থানকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পর পর দুটি যুদ্ধ পরিচালনা করেও কুরাইশরা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারেনি। মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় কুরাইশ বাহিনী শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা আরব গোত্রগুলোকে একত্র করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ করার প্রয়াস চালায় এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধের ঘটনাবলি

কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মুশরিক, কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের সমন্বয়ে ১০ হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন। কুরাইশদের যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর পেয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করেন। সমরবিদ সালমান ফারসি (রা.)-এর প্রস্তাবে এবং সকলের সম্মতিতে মদিনার উন্মুক্ত দিকে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মদিনার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকটা ছিল উন্মুক্ত। ৩,০০০ সৈন্যের মুসলমান বাহিনী ২০ দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দশ গভীর, দশ হাত প্রস্থ এবং ছয় হাজার হাত দীর্ঘ এক পরিখা খনন করেন। পরিখার পাড়ে ১০/১২ হাত উঁচু মাটির স্তূপ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তুতি রাখা হয়। ৩,০০০ সৈন্য থেকে ৫০০ সৈন্য দুই জন সেনাপতির অধীনে ইহুদি বসতিরচারদিকে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। টহলরত মুজাহিদদের 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি শুনে শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েএবং গৃহের বাইরে বের হয় না। আবু সুফিয়ান ১০,০০০ সৈন্য মহাসমারোহে নিয়ে এসে মদিনার উপকণ্ঠে তাঁবু স্থাপন করেন। কুরাইশরা প্রথমে মল্লযুদ্ধ এবং পরে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল। শত্রুরা পরিখা খনন দেখে হতভম্ব ও বিস্মিত হয়। তারা সকল প্রস্তুতি দেখে একযোগে পরিখা আক্রমণ করে। কিন্তু খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল প্রমুখ খ্যাতনামা কুরাইশরা মুসলমানদের প্রতি আক্রমণের মুখে টিকতে পারলেন না। যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে কুরাইশরা ২৭ দিন মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল। একদিন সন্ধ্যায় ভীষণ ঝড় উঠল এবং কুরাইশদের তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে গেল। এরপর কুরাইশ, ইহুদি, বেদুইনরা ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান। এ যুদ্ধে ৬ জন মুসলমান শহিদ হন এবং ৩ জন মক্কাবাসী প্রাণ হারায়।

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধের ফলাফল

বিগত যুদ্ধগুলোর ন্যায় খন্দক যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী। কারণ প্রত্যেকটি যুদ্ধের ভিন্ন মাত্রা ও তাৎপর্য রয়েছে।

১. বুদ্ধিদীপ্ত রণকৌশল নির্ধারণ: আরবের প্রচলিত যুদ্ধ ব্যবস্থার বাইরে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করায় কুরাইশ বাহিনী প্রথমেই ভড়কে যায় এবং যুদ্ধ করার মনোবল হারায়। কারণ এ রকম যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। মুসলমানরা নিজেদের ইচ্ছে ও সুবিধামতো দাবার ছক সাজিয়ে শত্রু পক্ষের জন্য অপেক্ষা করে। খন্দক যুদ্ধের পরবর্তী কোনো যুদ্ধে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের মতো মনোবল, সাহস, আড়ম্বর কুরাইশদের মধ্যে দেখা যায়নি।

২. ধৈর্যহীন হয়ে পড়া: কুরাইশরা সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে আসে। তারা পরিখা খনন দেখেই মনোবল হারায়। তারপর তারা দীর্ঘ ২৭ দিন গোটা মদিনা অবরোধ করে রেখেও পরিখা ভাঙতে না পেরে সেনাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয় এবং অবরোধ প্রত্যাহারের চাপ তৈরি হয়। অবশেষে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যায়।

৩. খোদাদ্রোহীদের মহাপরাজয়: খন্দকের যুদ্ধে হঠকারী বেদুইন, ষড়যন্ত্রকারী ইহুদি ও খোদাদ্রোহী মুশরিক কুরাইশরা যুদ্ধের শেষপর্যন্ত সুশৃঙ্খল ও একই মতে থাকতে পারেনি। সম্মিলিত বাহিনীর ব্যক্তি ইমেজ সম্পদ ও একতা বিনষ্ট হয়। তাদের সামরিক দুর্বলতাও প্রকাশ পায়।

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধের ফলাফল

৪ . মুসলমানদের বিশ্ববিজয়ের সূচনা: খন্দকের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য গৌরব, সম্মান ও জাতিগত ইমেজ নিয়ে আসে। খন্দক যুদ্ধের পর কুরাইশদের বৃথা আস্ফালন যেমন থমকে যায়, তেমনি ইহুদি ও বেদুইনদের ষড়যন্ত্রে ভাটা আসে। মুসলমানগণ আত্মরক্ষামূলক ভূমিকার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। এককথায় মুসলমান বাহিনী সম্মিলিত বাহিনীর কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক এস. এম ইমামুদ্দিন বলেন, "The break up of the confederacy marked the complete failure of the Makkans and laid the foundation of the Muslim state in Medinah, which was shortly to expand all over Arabia and the neighbouring countries." অর্থাৎ উক্ত সম্মিলিত বাহিনীর ভাঙনের ফলে মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় প্রতিভাত হয় এবং মদিনা রাষ্ট্রে ভিত্তি সুদৃঢ় হয়- যার আধিপত্য অল্প সময়ের মধ্যে আরব ও প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর বিস্তার লাভ করে। ১২

৫. চরম শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসের বিজয়: আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রেখে মুসলমান বাহিনী ধৈর্য, সংযম, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, দূরদর্শিতা, উন্নত রণকৌশল, একতা ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ফলে চরম বিপদের দিনেও সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়। জোসেফ হেল বলেছেন, "খন্দকের যুদ্ধের ফলাফল ছিল সংখ্যাধিক শক্তির ওপর শৃঙ্খলা ও একতার নব বিজয়।

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধের ফলাফল

৬. ইহুদি বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযান: উহুদের যুদ্ধের সময় থেকে বনু কুরাইযা গোত্রের ষড়যন্ত্র, হঠকারিতা বিশ্বাসঘাতকতা, কুরাইশ ও বেদুইনদের সাথে আঁতাত মুসলমানদের অতিষ্ঠ করে তোলে। খন্দকের যুদ্ধে তারা মুসলমানদের বিপক্ষে কুরাইশদের পক্ষে অবলম্বন করে। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হযরত মুহাম্মদ (সা.) বনু কুরাইযার দুর্গ অবরোধ করেন। কয়েক সপ্তাহ (দুই সপ্তাহ) অতিবাহিত হওয়ার পর তারা তাদের পুরাতন মিত্র আউস গোত্রের সাদ বিন মোয়াযকে প্রতিনিধি ও বিচারক মনোনীত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহুদিদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। সাদ বিন মোয়ায রায় ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে, যোদ্ধাক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে এবং শিশু ও নারীদের দাস করা হবে। রায়ের ক্ষেত্রে তিনি তাওরাতের বিধান প্রয়োগ করেন। তাঁর রায় মোতাবেক ২৫০ জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করা হয়। নারীদের মধ্যে থেকে 'রায়হানা' নামক জনৈক ইহুদি মহিলাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিবাহ করে নিজ পরিবারভুক্ত করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক কারণে ইহুদিদের প্রাণদণ্ড হলেও, জাতিগতভাবে মুসলমানগণ ইহুদিদের ঘৃণা করে না। যুদ্ধবন্দি ক্রীতদাসীকে এতখানি মর্যাদা এর পূর্বে আর কেউ দেয়নি।

খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

খন্দক যুদ্ধের ফলাফল

পরিশেষে বলা যায়, বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ তথা বিধর্মীদের পরাজয়ে মুসলমানদের মনোবল যত চাঙা হয়, তেমনি বিধর্মীদের নৈতিক মনোবল তত ভেঙে পড়ে। গোটা আরবের সম্মিলিত শক্তিকে ব্যবহার করেও কুরাইশদের পরাজয় গোটা আরবে মুসলমানদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। বলা যায়, খন্দকের যুদ্ধের পরই মুসলমানরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায়। কুরআন শরিফে সুরা আহযাবে (৯-১৩ আয়াতে) খন্দক যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এ যুদ্ধের পটভূমিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয় সম্ভব হয়।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –০৭ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

This Topic is important for

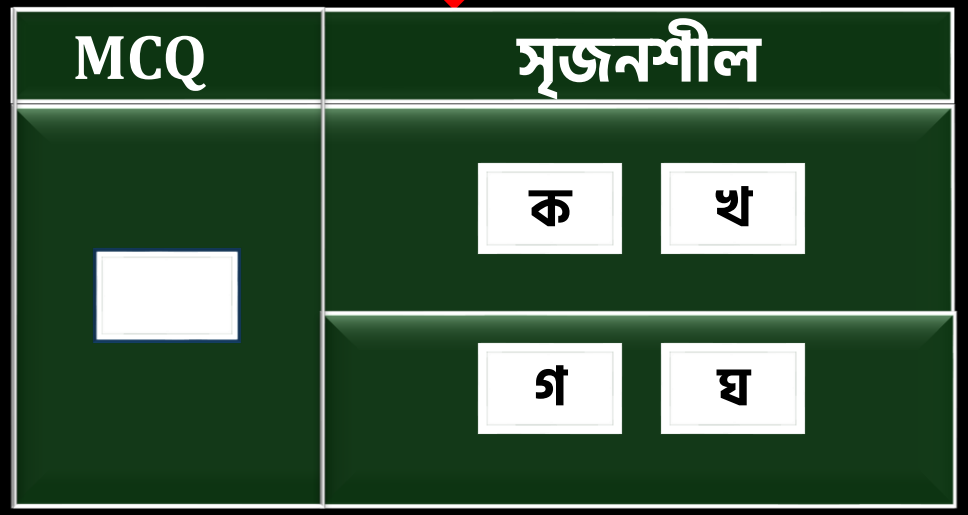

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক

রাসুল (সা.)-কে প্রতিশ্রুত নবি হিসেবে গ্রহণ: ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডে একজন নবির আবির্ভাব সম্পর্কে অবগত ছিল। তাই নবুয়ত লাভের পর ইহুদিরা রাসুল (সা.)-কে "প্রতিশ্রুত পয়গম্বর' বা 'Promised Prophct' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এজন্য তারা রাসুল (সা.) কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়।

ইহুদিদের সাথে সুসম্পর্ক: মদিনায় হিজরতের পর প্রথমদিকে ইহুদিদের সাথে রাসুল (সা.)-এর সম্পর্ক ভালো ছিল। ঐতিহাসিক এম ওয়াট বলেন, "রাসুল (সা.) মদিনায় ইহুদিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য ১০ মহররম তাদের মুক্তির দিনে রোজা রাখতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবি (সা.) এবং তাঁর অনুসারীরা ইহুদিদের যাবতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন।

ইহুদিদের সাথে সম্পর্কের অবনতি: ইতিহাসবিদ ইবনে হায়কলের মতে, "নাজরানের ৬০ সদস্য বিশিষ্ট খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল মদিনায় রাসুল (সা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ এবং সম্মেলনে যোগ দিলে ইহুদিদের সাথে মুহাম্মদ (সা.) -এর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এছাড়া ইহুদি কবিদের রচিত কবিতা মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে সম্পর্ক আরো জটিল করে তোলে। ইহুদিরা প্রায়ই ধর্মীয় বিভিন্ন জটিল ও বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করে নবমুসলিমদের বিশ্বাসে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক

ইহুদিদের গোপন ষড়যন্ত্র: মদিনার ইহুদিরা মনে করেছিল যে, রাসুল (সা.) মদিনায় তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হবেন। এজন্য তারা মহানবি (সা.) -এর সহায়তায় মদিনায় একটি ইহুদি ফ্রন্ট গড়ে তুলবে বলে মনে করেছিল। কিন্তু ইসলামের উদীয়মান শক্তিতে তাদের যে আশা সফল হয়নি। ফলে আউস ও খাযরাজ গোত্রের ভেতরে বিদ্রোহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইহুদিরা তৎপর হয়ে ওঠে এবং গোপনে মক্কার কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

মদিনার বনু কায়নুকা গোত্রের সন্ধিভঙ্গ ও বহিষ্কার: মদিনায় তখন তিনটি ইহুদি গোত্র বাস করত। যেমন- বনু কায়নুকা, বনু নাজির ও বনু কুরায়জা। এসব গোত্র রাসুল (সা.) -এর মদিনা সনদে স্বাক্ষর করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বনু কায়নুকা গোত্রের লোকেরা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। সন্ধির শর্ত অনুসারে বদরের যুদ্ধে তাদের মুসলমানদের সাহায্য করার কথা ছিল। কিন্তু তারা সাহায্য না করে গোপনে কুরাইশদের সাহায্য করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। বনু কায়নুকা গোত্রের এসব কাজের জন্য মহানবি (সা.) শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ৬২৪ সালে মদিনা থেকে বিতারিত করেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক

বনু কুরায়জা গোত্রের ষড়যন্ত্র: মদিনার ইহুদি গোত্রের বনু কুরায়জারা ছিল বিশ্বাসঘাতক। উহুদের যুদ্ধে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের সাথে ভালো আচরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে তারা আবারও বিশ্বাসঘাতকতা করে কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করে। এজন্য খন্দকের যুদ্ধের পর রাসুল (সা.) তাদের অবরোধ করেন। উপায়ন্তর না দেখে বনু কুরায়জা গোত্র আউস গোত্রের দলপতি সাদ বিন মুয়াজের সালিশি মানতে রাজি হয়। তিনি আইন অনুসারে বনু কুরায়জা গোত্রের সব পুরুষকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে বন্দি করার নির্দেশ দেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক

খাইবারের যুদ্ধ: মদিনা থেকে বিতারিত ইহুদিরা সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী খাইবারে বসতি স্থাপন করে। এখানে বসতি স্থাপন করে ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং বনু সাদ ও বনু গাতফান গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। তারা বহু মুসলমানদের হত্যা ও তাদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করে। এ সংবাদ পেয়ে মহানবি (সা.) ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৬০০ পদাতিক ও ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে খাইবার অবরোধ করেন। উপায়ন্তর না দেখে ইহুদিরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মহানবি (স.)-কে হত্যার চেষ্টা: ইহুদিরা সবশেষে মহানবি (সা.)-কে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রম রাসুল (সা.) প্রাণে রক্ষা পান। এরপরও মহানবি (সা.) ইহুদিদের ক্ষমা করে দেন। শুধু মাত্র প্রত্যক্ষভাবে এ ঘৃণিত কাজের সাথে জড়িত জয়নবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে খলিফা উমর (রা.) তাদের সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক

ইহুদি নীতির সমালোচনা: অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক যেমন- স্প্রেঙ্গার, উইল, অসবর্ন প্রমুখেরা মহানবি (সা.) -এর এ ইহুদি নীতির সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় ইহুদিদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ও গর্হিত আচরণ করেছেন। ইহুদিদের মদিনা থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং অনেককে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, ইউরোপীয় এসব ঐতিহাসিকদের মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ ইহুদিরা মদিনা সনদে স্বাক্ষর করেও একের পর এক সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। শুধু তাই নয়, তারা রাসুল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয়। কাজেই উক্ত ঐতিহাসিকদের এসব মন্তব্য সঠিক নয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "এটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মদিনা অবরোধের সময় এসব লোক (ইহুদি) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী ছিল।" ঐতিহাসিক মুইর বলেন, "যে কারণে মহানবি (সা.) ইহুদিদের শাস্তি প্রদান করেন। তা ছিল রাজনৈতিক,

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক

ইসলাম প্রচারের প্রথমদিকে মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য মুসলমানদের হিজরতকারী কয়েকটি দল আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজা নাজ্জাসির দরবারে আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ান। পরবর্তীকালে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মদিনার বসবাসকারী খ্রিষ্টানরাও মহানবি (সা.) -এর সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে।

-খ্রিষ্টানদের মহানবি (সা.)-এর সনদ প্রদান: ইসলামের দুঃসময়ে বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহারের কথা মনে করে ষষ্ঠ হিজরি সনে - তিনি সিনাই পর্বতের কাছাকাছি অবস্থিত সেন্ট ক্যাথারিন গির্জার পাদ্রীর ও অন্য খ্রিষ্টানদেরকে একটি সনদ প্রদান করেন।

সনদের শর্তসমূহ হলো-

১. খ্রিষ্টানদের ওপর অন্যায়ভাবে কোনো কর ধার্য করা হবে না।

২. কোনো খ্রিষ্টান ধর্মযাজককে গির্জা থেকে বহিষ্কার করা হবে না।

৩. কোনো খ্রিষ্টানকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে না।

৪. কোনো খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীকে তীর্থযাত্রা থেকে বিরত করা যাবে না।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক

৫. খ্রিষ্টানদের কোনো গির্জা ভেঙে সেখানে কোনো মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।

৬. গির্জা কিংবা কোনো উপাসনালয় মেরামত করার সময় যদি কোনো খ্রিষ্টান কোনো মুসলমানের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাকে সাহায্য করবে।

৭. স্বধর্ম ত্যাগ না করেও যেকোনো খ্রিষ্টান নারী যেকোনো মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য কোনো প্রকার জুলুম করতে পারবে না।

৮. আরবের বাইরের খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে সেজন্য আরবের খ্রিষ্টানদের দায়ী করা যাবে না।

এ মদিনা সনদ ছিল সত্যিকার অর্থে এক মহান দৃষ্টান্ত। আর সৈয়দ আমির আলী বলেন, "To all Christians, a Charter, which is a monument of enlightened tolerance." অর্থাৎ সব খ্রিষ্টানদের নিকট সনদ হিসেবে একটি অসাধারণ সহিষ্ণুতার কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ এটি জগতে এখনো দেদীপ্যমান আছে।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –০৮ হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক ০৮ - হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

৬ষ্ঠ হিজরিতে তথা ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল মহানবি (সা.) -এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অন্যতম ঘটনা। বিশিষ্ট সাহাবিদের অনুরোধ উপেক্ষা করে মহানবি (সা.) হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত করেছিলেন, এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় ফুটে ওঠে। এ সন্ধিকে পবিত্র কুরআন শরিফে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য (Evident Victory) বিজয় বলা হয়েছে।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির পটভূমি

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অনুসরণ করে বহু সাহাবি মাতৃভূমি মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন। মহানবি (সা.) ও সাহাবিদের অনেকেই দীর্ঘ ছয় বছর ধরে মাতৃভূমি দর্শন করেননি এবং হজও সমাধা করতে পারেননি। তাই ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে (৬ষ্ঠ হিজরিতে) মহানবি (সা.) ও তাঁর ১৪০০ সাহাবি যুদ্ধ বিরতির জিলকদ মাসে উমরা হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মহানবি (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের মক্কা আগমনের সংবাদ পেয়ে পথ রোধের জন্য কুরাইশরা খালিদ ও ইকরামের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। মহানবি (সা.) মক্কার খোযা সম্প্রদায়ের বুদাইলের নিকট এ সংবাদ অবগত হন। তখন মহানবি (সা.) ও সাহাবিগণ মক্কা হতে ৯ (নয়) মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন।

হুদায়বিয়া মক্কার উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। বর্তমানে এ এলাকাটি 'শোমায়সিয়া' নামে অভিহিত। হুদাইবিয়ার জায়গার নামানুসারে এ সন্ধির নাম হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধি। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা হতে উত্তরে অবস্থিত হুদাইবিয়া নামক স্থানে বিশ্বনবি (সা.) -এর সাথে মক্কার কুরাইশদের যে সন্ধি হয়েছিল, ইসলামের ইতিহাসে একে হুদাইবিয়ার সন্ধি বলা হয়। আরবিতে সন্ধি সোলহে অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে 'সোলহে হুদাইবিয়া' নামে ব্যক্ত করে থাকেন। মহানবি (সা.) মুসলমান পক্ষের উদ্দেশ্য জানাতে প্রথমে বুদাইল এবং পরবর্তীতে হযরত উসমানকে মক্কায় প্রেরণ করেন। মক্কাবাসীরা আলোচনার জন্য আবওয়া বিন মাসুদকে পাঠালে তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির পটভূমি

বাইআতে রিদওয়ান/ বাইআতুস শাজারা: মহানবি আবওয়ার সাথে আলোচনা ব্যর্থ হলে খেরাস ও হযরত উসমান (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিন দিনের মধ্যে হযরত উসমান (রা.)-এর ফিরে না আসার কারণে মুসলমান শিবিরে গুজব উঠল যে, কুরাইশরা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ এবং মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার নিয়তে একটি বাবলা গাছের নিচে সমবেত সাহাবিদের নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবি (সা.) -এর হাতে হাত রেখে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে যে, তাঁরা সকলেই আল্লাহর নামে জীবন কুরবানি দিতে রাজি আছেন। এ শপথ বা বাইআতকে বাইআতুর রিদওয়ান (Pledge of good pleasure) অথবা বৃক্ষের নিচে শপথ বা বাইআতুস শাজারা (Pledge of the tree) বলে অভিহিত করা হয়। এ শপথের সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে তারা হযরত উসমান (রা.)-কে ছেড়ে দেন এবং সোহায়েল ইবন আমরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নিকট প্রেরণ করেন। এবার মেকরায ইবন হাফস নামক জনৈক ব্যক্তি মহানবি (সা.) -এর নিকট আগমন করেন। তিনি মহানবি (সা.) -এর নিকট কথাবার্তা বলছিলেন এমন সময় সোহায়েল ইবনে আমর নামক দ্বিতীয় এক ব্যক্তি কুরাইশদের পক্ষ হতে আগমন করেন। মহানবি (সা.) তাকে দেখে বললেন যে, মনে হয় কুরাইশরা বাস্তবিকই মীমাংসার ইচ্ছা করেছে। (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আল ফাতহ: আয়াত ১৮ দ্রষ্টব্য।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলি

সন্ধির শর্তাদি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে হযরত আলী (রা.) সন্ধির লেখক স্থির হলেন। তিনি ইসলামি রীতিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখলেন। কিন্তু সোহায়েল আপত্তি তুললেন। তার কথামতো লেখা হলো 'বিসমেকাআল্লাহুমা' অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার নামে। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এরূপ লিখতে আদেশ দিলেন, 'এটি আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের সঙ্গে চুক্তিপত্র'। সোহায়েল 'আল্লাহর রাসুল' শব্দের প্রতি আপত্তি তুললেন। তার কথামত লেখা হলো 'এটি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর সঙ্গে চুক্তিপত্র'। হযরত আলী (রা.) রাসুলুল্লাহ শব্দটি মুছে দিতে ইতস্তত করছিলেন। তখন মহানবি (সা.) নিজে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি মুছে দিলেন। তিনি যুক্তি দিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসুল এবং আব্দুল্লাহর পুত্রও। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ-

১. মুসলমানগণ এ বছর অর্থাৎ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হজ না করে মদিনায় ফিরে যাবে।

২. আগামী বছর (৬২৯ সালে) তাঁরা মক্কায় এসে হজ করতে পারবে, তবে তিন দিনের বেশি থাকতে পারবে না। এ তিন দিন মক্কাবাসী নগর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করবে।

mu ৩. শুধু আত্মরক্ষার জন্য পথিকদের যতটুকু প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া মুসলমানগণ অস্ত্রশস্ত্র সাথে আনতে পারবে না।

৪. মক্কার নবদীক্ষিত কোনো মুসলমান মদিনায় গিয়ে আশ্রয় চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫. মদিনা হতে কোনো লোক মক্কায় ফিরে আসলে কুরাইশরা তাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলি

৬. আরবের যেকোনো গোত্র তাদের ইচ্ছামতো মুসলমানদের সাথে অথবা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। মিত্র গোত্রের ক্ষেত্রেও এ সন্ধি কার্যকর হবে।

৭. আগামী দশ বছরের জন্য (৬২৮ – ৬৩৮) কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

৮. চুক্তির মেয়াদকালে উভয় পক্ষের জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে এবং কোনো প্রকার লুণ্ঠন বা ১৪আক্রমণ করবে না।

১৯. সন্ধির উল্লিখিত শর্তাবলি উভয় পক্ষ মেনে চলবে।

এছাড়াও আরও কিছু শর্ত সন্ধিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে মহানবি (সা.) মুসলমানদের মধ্য হতে সাক্ষীস্বরূপ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), আব্দুর রহমান বিন-আউফ, সাদ-বিন আবিওয়াক্কাস এবং কুরাইশদের পক্ষে সুহাইল বিন আমর, মুকাররাম বিন হাফাস সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। হযরত আলী (রা.) লেখক হিসেবে স্বাক্ষর করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির ফলাফল

কুরাইশ কর্তৃক ইসলামকে ধর্মের স্বীকৃতি: ৬২৮ সালে সাক্ষরিত হুদাইবিয়ার সন্ধির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। ৬২৪ সালে মদিনা সনদ রচনার মাধ্যমে মদিনাবাসী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মকে রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অনুরূপভাবে ৬২৮ সালে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা ইসলাম ধর্মকে একটি 'ধর্ম' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

মহানবি (সা.)-এর নেতৃত্বের স্বীকৃতি: কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা ও মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়। বিভিন্ন কারণে বিধর্মীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর সাথে চলাফেরা করার সুযোগ পায়নি। এ সুযোগে মক্কার কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন কুৎসা ছড়ায়। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে সমগ্র আরবের জনসাধারণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির ফলাফল

প্রকাশ্য বিজয়/ফাতহুম মুবিন: কতিপয় সাহাবি সন্ধির শর্তাবলি মেনে না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিকট ভবিষ্যতে মুসলমানদের মঙ্গল নিহিত আছে মনে করে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। মক্কার কুরাইশদের নিকট থেকে হুমকিমুক্ত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য শত্রুদের দমন করার সুযোগ লাভকরেন। তিনি খায়বারের ইহুদিদের দমন করেন। এ সন্ধির ফলে মক্কা ও মদিনা নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারের সুযোগ লাভকরে। এ সন্ধিকে পবিত্র কুরআন শরিফে মহাবিজয় বা 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বলেন, "মুহাম্মদ (সা.) যেখানে ১,৪০০ লোক নিয়ে হুদাইবিয়ায় গিয়েছিলেন, সেখানে দুই বছর পর ১০,০০০ (দশ হাজার) লোক নিয়ে মক্কা বিজয় করেন। "১৩ ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধির গুরুত্ব ও এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল অপরিসীম। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, "হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ জয়ী হয়েছিলাম, সেরূপ কখনই হয়নি।" সৈয়দ আমীর আলী মন্তব্য করেন, "বিশ্ববাসীদের আত্মসংযম ও সন্ধির প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন ইসলামের শত্রুদের প্রতি গভীর রেখাপাত করে।" এরূপ বিভিন্ন কারণে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে 'Land Mark' অর্থাৎ মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি বিশ্বাসীদের আত্মসংযম ও সন্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামের শত্রুদের মনে গভীর রেখাপাত করে। Wikipedia-তে বলা হয়েছে, "The treaty was Muhammad's master piece of deplomacy. It was a triumph."

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির ফলাফল

ইসলামের প্রচার ও প্রসার: হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত মোতাবেক হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা মুসলমানদের সাথে কুরাইশদের দশ বছর যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকার সিদ্ধান্ত। এর ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সামরিক অভিযান থেকে মনোযোগ সরিয়ে দূত প্রেরণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। যুদ্ধবিগ্রহের কারণে কুরাইশ ও মুসলমান উভয় পক্ষের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছিল কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য পুরোদমে চলতে থাকে। মদিনার অর্থনীতিতে এর সুস্পষ্ট ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আল্লাহর মদদে দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে জড়ো হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী লেখক জোহরা বলেন, "পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন কোনো বিবেকবান লোক ছিল না, যে ইসলামের ছায়াতলে আসতে প্রলুব্ধ হয়নি।" "There was no man of sense and judgement amongst the idolators who was not led thereby to join Islam." ইসলামের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে হুদাইবিয়ার সন্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে গোটা আরবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেকে উপস্থাপন করার' সুযোগ পায়। এর ফলে বিভিন্ন গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির ফলাফল

অসংখ্য নারী ও শ্রেষ্ঠ বীরদের ইসলাম গ্রহণ: হুদাইবিয়ার সন্ধিতে নারীদের ব্যাপারে কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে নারীরা দলে দলে মদিনায় এসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সন্ধিতে কোনো শর্ত না থাকায় কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নিকট কোনো দাবি উত্থাপন করতে ব্যর্থ হয়, ফলে ইসলাম শক্তিশালী হতে থাকে। বিভিন্ন গোত্রের সাথে মেলামেশার সুযোগে বিভিন্ন বেদুইন গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ সন্ধির পর খালিদ-বিন-ওয়ালিদ এবং আমর-বিন-আল-আসের মতো বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির ফলাফল

শান্তি প্রতিষ্ঠা: বিভিন্ন স্থানে সামরিক অভিযান প্রেরণের ফলে মদিনা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতো। এমতাবস্থায় হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের হুমকি না থাকায় মদিনায় শান্তি ও স্বস্তিভাব বিরাজ করে। মহানবি (সা.) বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদের প্রশিক্ষণদানের সুযোগ লাভ করেন। হুদাইবিয়া থেকে ফিরে এসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কাছের ও দূরের সম্রাটদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে আবিসিনিয়া, পারস্য, মিশর, রোমের কায়সার (তাঁর প্রতিনিধি), ইয়ামামা, ওমান, বাহরাইন ও ইয়ামেনের রাজা ও সম্রাটদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মক্কার কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। আরও বলা যায়, ইসলামের প্রধান শত্রু ছিল মক্কা তথা কুরাইশরা। ৬২৮ সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে কুরাইশদের ওপর কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সহজ হয়ে আসে। ৬২৮ সালেই অর্ধেক মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল

হুদাইবিয়া সন্ধির ফলাফল

মুলতবি হজ পালন: হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তানুসারে ৬২৯ খ্রি. হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীরা মক্কায় ওমরা হজ পালনের উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। এ তিন দিন মক্কাবাসীরা নগর ত্যাগ করে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। নগর ত্যাগ করা কুরাইশদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক এবং পীড়াদায়ক ছিল। মহানবি (সা.) বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবি-রাসুলদের স্বপ্ন ওহি। তাঁদের স্বপ্ন সত্য। কিন্তু বাস্তবে ফল না দেখে সাহাবিগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে স্বপ্ন সত্য না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন মহানবি (সা.) বলেন, "এ বছরই আমার স্বপ্ন সত্য হবে, তা তো আমি বলিনি।" মহান আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে সূরা ফাতাহর ২৭নং আয়াতে বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর রাসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই 'মসজিদুল হারামে' নিরাপদে প্রবেশ করবে, কেউ কেউ মস্তকমুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে।" হুদাইবিয়ার ময়দানে সাহাবিগণ মুহাম্মদ (সা.) -এর হাতে হাত রেখে জিহাদ করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল। আল্লাহ পাক সেসব সাহাবিদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। পবিত্র কুরআন শরিফের সূরা ফাতাহর ১৮নং আয়াতে বলেন, "বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট শপথ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জ্ঞাত ছিলেন; তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের দান করলেন আসন্ন বিজয়।"

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –০৯ খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক ০৯ - খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

ইহুদি সম্প্রদায় মদিনা থেকে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী খাইবার নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। বানু নাজির ও বানু কুরাইজা গোত্রের ইহুদিগণ ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মুনাফিক দলের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং গাতফান ও অন্যান্য বেদুইন গোত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা খন্দকের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে বেদুইন গোত্রের সহযোগিতায় ৪,০০০ সৈন্যের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। এ সংবাদ শুনে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে (৭ম হিজরির মহররম মাসে) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহুদিদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য ২০০ অশ্বারোহীসহ ১,৬০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খাইবারের দিকে যাত্রা করেন। ইহুদিদের অবরুদ্ধ করা হয়। আল কামুস দুর্গসহ সকল দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ সময়ে হযরত আলী (রা.) বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন বলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাকে আসাদউল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। এ যুদ্ধে ইহুদি সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মহানবি (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে নির্বিঘ্নে তথায় বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ইহুদিরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। হারেছের কন্যা জয়নব খাইবারের যুদ্ধে পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিষ প্রয়োগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার চেষ্টা করে। খাদ্যে বিষ প্রয়োগের ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর সাহাবি নিহত হলেন।

খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

কিন্তু বিষ মিশ্রিত সামান্য খাদ্য মুখে দেওয়ায় সৌভাগ্যক্রমে মহানবি (সা.)-এর জীবন রক্ষা পায়। সাহাবির মৃত্যুর জন্য জয়নবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু সমগ্র ইহুদিদের ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার করা হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মহানুভবতার এটি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সৈয়দ আমির আলী বলেন, নবির জীবন রক্ষা পেল কিন্তু বিষের ক্রিয়া তার শরীরে লাভ করায় পরবর্তী জীবনে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইহুদিদের বিপর্যয়ের পর তাদের ওপর বাধ্যতামূলক কর প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। কর প্রদানপূর্বক ইহুদিদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ এবং জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করা হয়।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –১০ মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক - ১০ মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)

হজ থেকে মদিনায় ফিরে আসার পর রাসুল (সা.) রোমান সামন্তরাজ সোরাহবিল কর্তৃক মুতায় তাঁর দূতকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে একটি অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি অষ্টম হিজরিতে (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে) তাঁর দত্তকপুত্র জায়েদের নেতৃত্বে ৩,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মুতায় প্রেরণ করেন। তিনি এ যুদ্ধে পর পর তিনজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সেনাপতি যায়েদ (রা.), পতাকাবাহী জাফর (রা.) ও আবদুল্লাহ্ (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর চরম বিপর্যয়ের মুখে খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) নেতৃত্ব গ্রহণ করলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। এ যুদ্ধে খালিদের (রা.) অসীম সাহস ও রণনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) তাঁকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) উপাধি দান করেন। এ যুদ্ধের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এটি ছিল খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মিথ্যার ওপর সত্যের জয় অধিষ্ঠিত হয়।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –১১ মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক - ১১ মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

রক্তপাতহীন মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মক্কা তৎকালীন সময়ে গোটা আরবের মধ্যে ছিল প্রবল প্রতিপত্তিশালী। গোটা আরবে মানমর্যাদায়ও ছিল সর্বোচ্চ। এ মক্কাই বার বার ইসলামের আলো নিভে দিতে চেয়েছে কিন্তু সময়ের ব্যবধানে মক্কার সেই চেতনা, প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে। সত্যের কাছে মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নিজেই ইসলামকে আহ্বান করেছে এবং ইসলামের সাথে আলিঙ্গন করেছে।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

মক্কা বিজয়ের কারণ

মক্কার উপকণ্ঠে বনু বকর ও বনু খোযা দুটি গোত্র বসবাস করত। হুদাইবিয়ার সন্ধি মোতাবেক বনু খোযা গোত্রের সাথে মুসলমানদের সুসম্পর্ক ছিল। বনু বকর গোত্রকে সহযোগিতা করতে গিয়ে মক্কার কুরাইশরা বনু খোজা গোত্রকে সশস্ত্র আক্রমণ করে। বনু খোজা গোত্র এর প্রতিকার চেয়ে মহানবি (সা.) -এর নিকট আরজি জানায়। মহানবি (সা.) বনু বকর ও কুরাইশদের নিকট তিনটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। প্রস্তাব তিনটি হলো-

১. তোমরা বনু খোজায়া গোত্রকে ক্ষতিপূরণ দাও,

২. অথবা বনু বকর গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর,

৩. হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বাতিল ঘোষণা কর।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

মক্কা বিজয়ের কারণ

কুরাইশরা ৩নং প্রস্তাবকে সুবিধাজনক মনে করে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বাতিল ঘোষণা করে। এরপর মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এ অভিযানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) দশ হাজার (১০,০০০) সৈন্যের একট বিরাট বাহিনী গঠন করেন। ১০ রমজান অষ্টম হিজরি মোতাবেক ১ জানুয়ারি ৬৩০ সালে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেন। আবু সুফিয়ান সেই রাতে হাকীম ইবনে নিজাম এবং বুদায়েল নামক দুই জন সহচর নিয়ে মাররুমে স্থাপিত মুসলমান শিবিরের নিকটবর্তী হলে হযরত ওমর (রা.) তাদের হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নিকট নিয়ে আসেন। আবু সুফিয়ানের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর মধুর কথোপকথনে আবু সুফিয়ান ও তাঁর সহচর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথে সাগ্রহে আলিঙ্গন করেন। এসময় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আব্বাস হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর হাতে ইসলাম কবুল করেন। আবু সুফিয়ান ও তাঁর সহচর এবং আব্বাস (রা.) সহ সকলে মক্কায় গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর পক্ষে জনমত তৈরি করতে থাকেন।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যিনি আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, স্বাভাবিকভাবে তাঁর আখলাকও শ্রেষ্ঠতম। এজন্য মহানবি (সা.) আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত আয়েশা (রা.) সংক্ষেপে বলেছিলেন যে, তাঁর চরিত্র ছিল আল কুরআন। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন শরিফে উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তার সবগুলোই মহানবি (সা.) -এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে মহানবি (সা.)-এর আচরণে এ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

অনাক্রমণের আদেশ: মহানবি (সা.) মক্কার অনতিদূরে মাররুজ জাহরান নামক উপত্যকায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন। এখানে তিনি তাঁর সামরিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সকল সাহাবিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোনো সাহাবি বিনা প্রয়োজনে ব্যক্তিগত আক্রোশে কাউকে আঘাত না করে। মক্কাবাসীর কেউ আক্রমণ করলে শুধু আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। মক্কা বিজয়ে মক্কার কয়েকজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। এ সংবাদ পেয়ে মহানবি (সা.) খালিদ বিন ওয়ালিদের নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ বলেন, "তারা প্রথম তীর নিক্ষেপ করে দুইজনকে শহিদ করেছিল, আমি অতি সংযতভাবে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেছি মাত্র।" ইসলামি বিশ্বকোষ।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা: মহানবি (সা.) অহেতুক রক্তপাত পছন্দ করতেন না। তিনি যুদ্ধকে এড়িয়ে মক্কা বিজয় করার চেষ্টা করলেন। তিনি রাতের একটি সময়ে ১০ হাজার সাহাবিকে এক সাথে আগুন জ্বালানোর আদেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল মক্কাবাসীদেরকে ভীতি দেখানো এবং বিনা যুদ্ধে মক্কা ছেড়ে দিতে। মহানবির আদেশমতো ১০ হাজার সাহাবি এক সাথে আগুন জ্বালিয়েছিলেন। এতে এক বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। মক্কাবাসী এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করে। কুরাইশরা মুসলমানদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করার সাহস ও মনোবল দুই-ই হারায়। সে সময় মক্কায় প্রবেশের ৪টি পথ ছিল। যথা- উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ দিক ও উত্তর-পূর্ব দিক। যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মহানবি (সা.) তাঁর সাহাবিদেরকে ৪টি রাস্তা দিয়ে একসাথে প্রবেশের আদেশ দেন। এর ফলে মক্কার কুরাইশরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

নিরাপত্তা দান: মহানবি (সা.) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশে নিরাপত্তার কয়েকটি প্রস্তাব দিলেন-

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

১. যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিবে।
২. যারা কাবাগৃহ সীমানায় আশ্রয় নিবে।
৩. যারা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে।
৪. যারা অস্ত্র ত্যাগ করবে।

এ প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশ্য ছিল কেউ যেন সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে। আবু সুফিয়ান আবু জেহেলের পরে মক্কার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় হতে ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান মক্কার নেতৃত্বে ছিলেন।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

বিজয় সম্পন্নকরণ: ইসলাম গ্রহণ করে আবু সুফিয়ান দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন "হে কুরাইশগণ আজ হযরত মুহাম্মদ (সা.) দশ হাজার সৈন্যসহ মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত। তিনি অভয় দিয়ে এ ঘোষণা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি' কাবাগৃহে অথবা আমার গৃহে আশ্রয় নিবে অথবা যে ব্যক্তি নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকবে, তার ভয় নেই। জেনে রাখ, আমি আর এখন তোমাদের দলপতি নই, আমি এখন মুসলমান।" ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন দলপতিকে মক্কার বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রবেশের আদেশ দেন। সবার শেষে ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র ওসামা (রা.)-এর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একই উটের পিঠে চড়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন। নগরে প্রবেশের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবিদের নিয়ে কাবা শরিফের চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। এরপর কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকেন। সাহাবিরা কাবার ৩৬০টি মূর্তি বাইরে নিয়ে এসে ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। কাবা শরিফ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নামাজের জন্য তৈরি করা হয়। হযরত বেলাল (রা.) আজান দেন। সকলেই মহা আনন্দে জামাতের সাথে নামায আদায় করেন। কুরাইশরা দূর থেকে এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় ১৫/২০ দিন অবস্থান করে এবং আচার-ব্যবহারে ইসলামের মহিমায় মক্কাবাসীদের হৃদয় জয় করে মদিনায় ফিরে আসেন।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

দয়া ও ক্ষমার দিবস: মক্কা বিজয়ের দিন ছিল ক্ষমা ও দয়ার দিন। নবুয়তপ্রাপ্তির পর হতে মক্কার কুরাইশরা মহানবি (সা.)-কে নির্যাতন করতে শুরু করে। এ নির্যাতন এক পর্যায়ে সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। শুধু নিজ বংশীয় কুরাইশ মুশরিকদের জন্য বহু মুসলমানকে শহিদ হতে হয়েছে। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা.)-এর দান্দান মোবারক (পবিত্র দাঁত) শহিদ হয়েছে। মুহাজিরগণ মক্কার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এত ত্যাগ, এত কষ্ট, এত বঞ্চনা সত্ত্বেও মহানবি (সা.) ও মুহাজিরগণ মক্কার কুরাইশদের ক্ষমা ঘোষণা করেন। কুরাইশদের অভয় দেওয়া হয় তারা যেন মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে না যায়। মক্কার নাগরিকগণ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার জুলুমের পরিণাম চিন্তা করছিল। তাদের স্বাভাবিক ধারণার বিপরীতে ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। মহানবি (সা.) বলেন, "আজ তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার ভয়ভীতি, তিরস্কার-ভর্ৎসনা প্রয়োগ করা হবে না। কারও ওপর কোনো অভিযোগ নেই, তোমাদের সকলকে ক্ষমা করা হলো।"

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

লুটতরাজবিহীন জয়: বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিজয়ী দল পরাজিত দলের ঘরবাড়ি লুট করেছে, অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। মক্কা বিজয়ে ১০ (দশ) হাজার সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিল। তাঁরা জানত যে ইসলামে পরদ্রব্য হরণ করা হারাম। অহংকার করা, অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সাহাবিগণ বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় হালাল খেতেন। কারণ ইবাদত-বন্দেগি কবুলের অন্যতম শর্ত হালাল খাওয়া। এসব আদর্শ ধারণ করার জন্যই ১০ হাজার সাহাবির কেউ মক্কাবাসীর ধনসম্পদে হাত দেয়নি, কোনো নারী ধর্ষিত হয়নি।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

অহংকারমুক্ত বিজয়: মক্কা মহানবি (সা.) -এর জন্মভূমি। তিনি মক্কা শরিফে লালিত-পালিত হয়েছেন এবং এখানেই নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন। সেই মক্কা হতে বাধ্য হয়ে মহানবি (সা.)-কে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছে। মক্কাবাসী দ্বারা অত্যাচারিত-নির্যাতিত মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন সেজদাবনত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করছেন এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছেন। আচরণে ঔদ্ধত্য নেই, দম্ভ নেই। নেই কোনো অসুরীয় উন্মাদনা, দানবীয় বিজয়মত্ততা। মহানবি (সা.) ছিলেন সর্বাধিক বিনয়ী, সর্বাধিক নম্র। মহাবিজয়ের বিজয়ী সম্রাট চরম বিজয়ের বিজয়ী সেনাপতি অতি সাধারণ বেশে অনাড়ম্বর পরিবেশে বিজিত নগরে প্রবেশ করছেন- এরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে মক্কাবাসীদের অন্তরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্টতা বৃদ্ধি পায়। তাদের ভাবোদয় হয় যে ইসলাম সত্যিই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

আল্লাহ পাকের একত্ববাদের ঘোষণা: মক্কা বিজয়ের দিনে মহানবি (সা.) আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো- আল্লাহ পাক ছাড়া এ বিশ্ব ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আর কেউ নেই। সমস্ত ইবাদত-বন্দেগি করতে হবে শুধু একজন আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য। আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য কোনো উকিল ব্যারিস্টার ধরতে হবে না। শুধু কুরআন ও হাদিস অর্থসহ বুঝে হৃদয়ঙ্গম করে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে। নব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে মহানবি (সা.) ইসলামের মূলনীতিগুলো শিক্ষা দেন।

ইসলাম গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা: ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো সঞ্জীবনী শক্তি কুরাইশদের ছিল না। কুরাইশদের পক্ষের বড় বড় নেতা, বীর ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। এতে মক্কার কুরাইশদের শক্তি, দম্ভ, বীরত্ব দুর্বল হয়। মক্কা বিজয়ের কিছু সময় পূর্বে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে মক্কার কুরাইশরা হয়ে পড়ে অসহায়, ভীত ও পরাজিত। বিজয়ী মহানবি (সা.) পরাজিত মক্কাবাসীদের শাস্তি দিতে পারতেন, দাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন উপরন্তু ইসলাম গ্রহণের শর্ত জুড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু দয়ার নবি (সা.)-এর কিছুই করলেন না। ইসলাম গ্রহণ করা বা না করাকে তাদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেন। ইসলাম গ্রহণের জন্য তরবারি ছিল না, জোর ছিল না, জবরদস্তি ছিল না, ধমক ছিল না, ভীতি প্রদর্শন ছিল না।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

প্রতিশোধ গ্রহণ না করা: সাহাবিগণ ছিলেন মহানবি (সা.)-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি। মক্কাবাসীদের দ্বারা সকল মুহাজির নির্যাতিত, অত্যাচারিত হয়েছিল। তাদের অত্যাচারে ধনসম্পদ সব হারিয়েছে। হযরত বেলাল (রা.), হযরত খাববাব (রা.)-সহ শত শত সাহাবির ওপর মক্কাবাসী অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছে। "মহানবি (সা.) মক্কাবাসীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন" এ সংবাদ পৌছার সাথে সাথে মুহাজির সৈনিকেরা মক্কাবাসীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাহাবিগণ মহানবির আদর্শ ও শিক্ষার আলো পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা ছিলেন আদর্শবান।

বংশীয় মর্যাদার বিলুপ্তি সাধন: বংশমর্যাদা আর আভিজাত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আরবদের কুলজি সাহিত্য। কবিতার

মূল উপজীব্য বিষয় ছিল বংশমর্যাদা। আরবের অধিকাংশ রক্তপাতের মূলে ছিল বংশমর্যাদা। মহানবি (সা.) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন হতে বংশীয় মর্যাদা বিলুপ্ত করা হলো। শুধু বংশীয় মর্যাদার কারণে সরকারি-বেসরকারি কোনো বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে না। বিজয়ের দিনে, আনন্দের দিনে, প্রতিরোধ গ্রহণের দিনে মহানবি (সা.)-এর এরূপ ঘোষণা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

মক্কা হতে মদিনায় হিজরত বন্ধ: পবিত্র বুখারি শরিফের ১৫৫০, ১৫৫১ ও ১৫৫২নং হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, মক্কা

বিজয়ের পূর্বে মক্কা দারুল হারব ছিল। মক্কা বিজয়ের ফলে মক্কা দারুল ইসলাম তথা মুসলিমদের দেশ বলে পরিগণিত হয়েছে। ফলে মক্কা হতে মদিনা হিজরতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। ১৫৫২নং হাদিসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, বর্তমানে (মক্কা হতে) হিজরতের আবশ্যক নেই, পূর্বে ইমানদার ব্যক্তি দীন-ইমান নিয়ে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি হিজরত করত এ ভয়ে যে, (মক্কায় থেকে) সে নিজ দীন-ইমান রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। বর্তমানে আল্লাহ তায়ালা মক্কায় ইসলামকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন মক্কায় ইসলাম পালন করতে কোনো বাধা নেই।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

মক্কা বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব সমগ্র আরবভূমিতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা ও মহানবি (সা.)-এর সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভসহ সকল দিক থেকে মহানবি (সা.) এর মক্কা বিজয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম।

মক্কা বিজয়ের সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অতুলনীয়। মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এজন্য ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন, "মক্কাবাসীর আত্মসমর্পণে আরব উপদ্বীপে রাসুল (সা.)-এর অপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।" মহানবি (সা.)-এর মহত্ত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে পৌত্তলিকরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তাই এ বিজয়কে পৌত্তলিকের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় বলা হয়। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, "এরূপে মুহাম্মদ (সা.) তার (দীর্ঘ দিনের) উচ্চাশার চরম শিখরে উপনীত হন।"

সাহাবিগণ ছিলেন মহানবি (সা.)-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি। "মহানবি (সা.) মক্কাবাসীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।" -এ সংবাদ পৌছার সাথে সাথে মুহাজির সৈনিকেরা মক্কাবাসীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাহাবিগণ মহানবির আদর্শ ও শিক্ষার আলো পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা ছিলেন আদর্শবান। মক্কা বিজয়ের দিনে মহানবি (সা.) আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো আল্লাহকে পাক ছাড়া এ বিশ্ব ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আর কেউ নেই।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

শান্তি নীতি

সমস্ত ইবাদত বন্দেগি করতে হবে শুধু একজন আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য। মক্কাবাসী দ্বারা অত্যাচারিত নির্যাতিত মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন সেজদাবনত অবস্থায় মক্কা প্রবেশ করছেন এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছেন। আচরণে ঔদ্ধত্য নেই, দম্ভ নেই। নেই কোনো অসুরীয় উম্মাদনা, দানবীর বিজয় উম্মওতা। মহানবি (সা.) ছিলেন সর্বাধিক বিনয়ী, সর্বাধিক নম্র। মহাবিজয়ের বিজয়ী সম্রাট চরম বিজয়ের বিজয়ী সেনাপতি অতি সাধারণ বেশে অনাড়ম্বর পরিবেশে বিজিত নগরে প্রবেশ করছেন এরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে আকৃষ্টতা বৃদ্ধি পায়। তাদের ভাবোদয় হয় যে, ইসলাম সত্যিই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

মক্কা বিজয় পরবর্তী অভিযানসমূহ

হুনায়নের যুদ্ধ (৩১ জানুয়ারি, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ): মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রীয়

ছিল কট্টর ও পৌত্তলিক। মক্কা বিজয়ের পর পবিত্র কাবায় পৌত্তলিকতার বিলোপ সাধন করায় তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর বিরুদ্ধে তীব্র রোষে ফেটে পড়ে। পূর্বপুরুষের ধর্ম পৌত্তলিকতার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে তারা কাবাঘর পুনরুদ্ধারে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী হুনায়ন উপত্যকায় বেদুঈনদের সহযোগিতা ২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। মহানবি (সা.) এ সংবাদ পেয়ে ১২,০০০ মুসলমান ও কুরাইশদের এক সম্মিলিত সৈন্য দল নিয়ে তাদের মোকাবিলা করেন। অষ্টম হিজরিতে (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে) উভয় পক্ষে হুনায়নে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলমান দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অবশেষে রাসুল (সা.) -এর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং সেনাপতি খালিদের (রা.) অসামান্য বীরত্বের জন্য মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেন। যুদ্ধে প্রায় ৭,০০০ শত্রু সৈন্য মুসলমানদের নিকট বন্দি এবং বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু, প্রচুর পরিমাণ রৌপ্য বা সমরাস্ত্র মুসলমানদের হস্তগত হয়। অপরদিকে মাত্র ৪-৫ জন মুসলিম সেনা শাহাদাত বরণ করেন। এ যুদ্ধের ফলে আরব অঞ্চলের প্রতিনিধিরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মৈত্রী ও একাত্মতা ঘোষণা করে।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

মক্কা বিজয় পরবর্তী অভিযানসমূহ

তায়েফ বিজয় (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ): হুনায়নের যুদ্ধে পরাজিত শত্রু সৈন্যরা তায়েফ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে পুনরায় মুসলমানদের

বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনায় মেতে ওঠে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কালবিলম্ব না করে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে আবু মুসার অধিনায়কত্বে তায়েফ দুর্গ অবরোধ করেন। তিন সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর তায়েফবাসী মহানবির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তিনি তাদের সকলকে ক্ষমা করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে। যে তায়েফবাসী একদিন তাঁকে প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় বিতাড়িত করে, তারাই আজ তাঁর অসীম ক্ষমায় ধন্য হয়ে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

মক্কা বিজয় পরবর্তী অভিযানসমূহ

তাবুক অভিযান (৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ): বাইজানটাইন (রোমান) সম্রাট হেরাক্লিয়াস দীর্ঘদিন থেকে সমগ্র আরবদেশ দখলের স্বপ্ন দেখছিলেন। তা সত্ত্বেও হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রেরিত দূতকে তাঁর দরবারে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর ও তায়িফে ইসলামের বিজয়ে আরবের সর্বত্র রাসুল (সা.)-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন। মুতার যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের বিপর্যয়ও তাকে মর্মাহত করে। পরিশেষে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক ইহুদিদের প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে হেরাক্লিয়াস ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। বাইজানটাইনদের সমরাভিযানের সংবাদে মুসলমানগণ নবি করিম (সা.) -এর নেতৃত্বে ১০,০০০ অশ্বারোহীসহ ৪০,০০০ অনুচরের এক বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত তাবুকে শত্রু পক্ষের গতিরোধ করেন। সম্ভবত সিরিয়াগামী বাণিজ্য পথকে নিরাপদ রাখার জন্য তিনি এ অভিযানের প্রয়োজনবোধ করেন। মুসলমানদের ব্যাপক সমর প্রস্তুতির সংবাদে বাইজানটাইন সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করায় কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। রাসুল (সা.) প্রায় তিন সপ্তাহ অবস্থান করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাবুকই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ অভিযান।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

মক্কা বিজয় পরবর্তী অভিযানসমূহ

এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রমকালে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে ও পানির অভাবের অসহনীয় কষ্ট ভোগ করেন বলে এ যুদ্ধকে 'কষ্টের যুদ্ধ' বা 'গাজওয়াতুল ওসরাৎ' বলা হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, হযরত উমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি এবং হযরত উসমান (রা.) ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১,০০০ উট ও ৭০টি অশ্ব যুদ্ধতহবিলে দান করেন। সাহাবিরাও সাধ্যমতো দান করেন। এ অভিযানের ফলে আয়লার খ্রিষ্টান গভর্নর ইউহান্না ইবনে বুইয়া এবং জাররা ও অবজমোখ নামক স্থানের লোকজন বার্ষিক করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। এছাড়া সিরিয়া সীমান্তের কয়েকটি ইহুদি ও খ্রিষ্টান বসতি এলাকা অধিকৃত হয় এবং দুমাতুল জান্দালের খ্রিষ্টান শাসক কায়সার ইবনে আব্দুল মালেক মহানবি (সা.)-এর কাছে এসে ২,০০০ উট ও ৮০০ ঘোড়া উপঢৌকন দিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। সবার সাথে সন্ধি স্থাপন করে ২০ দিন পর মহানবি (সা.) মদিনায় ফিরে যান। মহানবি (সা.) -এর জীবনে এটিই ছিল শেষ অভিযান।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ (৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচেষ্টায় নানা যুদ্ধে এবং বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সাফল্যের ফলে আরব ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজিত হলে মহানবি (সা.)-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম ব্যাপকভাবে আরব ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে। ফলে ৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে আরব ও আরব ভূখণ্ডের বাইরের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে মহানবি (সা.)-এর কাছে দলে দলে শান্তি প্রস্তাব আসে। ওমান, হাজরামাউত, নাজরান, ইয়েমেন, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চল মহানবি (সা.) -এর অভিযান ছাড়াই মদিনায় তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে আনুগত্যের শপথ করে। বনু তামিম, বনু মুস্তালিক, বনু কিনদাহ, বনু আজাদ, বনু তায়ীসহ বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইবনে হিশাম-এর মতে, এ বছর রাসুল (সা.) অসংখ্য প্রতিনিধিকে (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) সাদর অভ্যর্থনা জানান। এজন্য এ বছরকে 'প্রতিনিধি প্রেরণের বছর' বা 'সানাৎ-আল-উফুদ' (The Year of Deputation) বলা হয়। এটি শুধু ইসলাম ধর্মের প্রচারে সহায়তা করেনি, বরং পুরো আরব জাতিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে। ফলে আরবজাতি তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি বাইজান্টাইন ও পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যকে মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন করে।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ (৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসুল (সা.) কুরাইশ কর্তৃক রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি 'আল্লাহ' ও নিজ নামে মোহরাঙ্কিত করে বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রেরিত দূতদের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো-

১. হযরত দাহিয়্যা ইবনে কালবি (রা.) রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস।
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা (রা.) ইরানের সম্রাট কিমরা (খসরু পারভেজ)।
৩. হযরত আমর ইবনে উমাইয়া খামরী (রা.): আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসি।
৪. হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতাআ (রা.) : মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাত্তকিম।
৫. হযরত সালীত ইবনে আস সাহমি (রা.) : ওমানের বাদশাহ জায়কর।
৬. হযরত সালীত ইবনে আমর (রা.): ইয়ামামার সরদার হাইজা ইবনে আলী।

মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি

বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ (৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

৭. হযরত আলা ইবনে হাযরামি (রা.): বাহরাইনের শাসক মুনজের ইবনে সাবি।
৮. হযরত শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদি (রা.): গাসসানের শাসক হারেছ গাসসানি।
৯. হযরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাসযুমী (রা.): ইয়ামেনের শাসক হারেস হিসইয়ারি।

আবিসিনিয়ার নৃপতি নাজ্জাসি রাসুল (সা.)-এর পত্র পেয়ে ইসলাম কবুল করেন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ রাসুলুল্লাহর পত্র ছিড়ে ফেলে। এ কথা শুনে রাসুল (সা.) বলেন, "আমার পত্রকে যেমন সে ছিড়ে ফেলেছে ঠিক তেমনি মুসলমানদের হাতে তার রাজ্যও ছিন্নভিন্ন হবে। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –১২ বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক - ১২ বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

হজ মুসলিম সম্প্রদায় ও গোটা বিশ্বের মধ্যে একটি বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আর্থিক ত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমানের পবিত্র কাবা শরিফে অবস্থান মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। একজন বান্দার উচ্চতর বৌদ্ধিক ও আত্মিক শক্তি লাভের জন্য আল্লাহর নিদর্শন দর্শন ও ইসলামের ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

দশম হিজরিতে যখন দলে দলে লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন মহানবি (সা.) অনুধাবন করলেন তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব শেষ হয়েছে। তাঁর জীবনকাল ঘনিয়ে আসছে। তাছাড়া ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ) সারা জাহানের নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশক্রমে সূরা আল নসরসহ সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, ইনসান-ই-কামিল এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত ও কল্যাণের দিশারি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) -এর নিকট আবির্ভূত হন এবং আল নসরের আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করে শোনান। তাই এ সূরা নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিশ্চিত উপলব্ধি করেন যে, তাঁর জীবনের মহান কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে আসছে। এজন্য তাঁর মানসপটে শেষ হজব্রত পালনের দৃঢ়সংকল্প জেগে ওঠে। সুতরাং এবার তিনি হজ আদায় করার মনস্থ করলেন। এটি ছিল তাঁর নবিজীবনের প্রথম ও শেষ হজ। এজন্য একে বিদায় হজ বা হুজ্জাতুল বিদা বলা হয়। এ হজকে অনেকে 'হাজ্জাতুল বালাগ' বা 'আহকাম পৌছানোর হজ' নামেও আখ্যায়িত করে থাকেন। এ হজকে কেউ কেউ 'হাজ্জাতুল ইসলাম' বা 'ইসলামের হজ' নামেও আখ্যায়িত করে থাকেন। কারণ এ হজের দিনেই ইসলামের পূর্ণতা লাভ হয়েছিল।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ হজ পালনের উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার সাহাবিসহ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র জন্মভূমি মক্কা নগরীর দিকে রওয়ানা হন। হজের সকল বিধিবিধান পালন সম্পন্ন করার পূর্বে ৯ জিলহজ মহানবি (সা.) জাবাল-উল-আরাফাতের শীর্ষে জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনসমুদ্রকে লক্ষ করে এক ঐতিহাসিক ও মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন, যাতে ইসলামের পূর্ণ দীপ্তি ও সুষম রূপ ফুটে উঠেছে। ঐতিহাসিক ভাষণে মানবজাতির সামগ্রিক মুক্তি ও কল্যাণের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এজন্য এ ভাষণকে 'বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ' বলে যথার্থই উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি এ ভাষণটি ছিল বিশ্বমানবের 'একটি বিপ্লবাত্মক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা' এবং এ ঘোষণা সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে অপূর্ব দলিল হিসেবে অগ্রগণ্য।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

বিদায় হজের ভাষণের বিশেষ দিকসমূহ

বিদায় হজে মহানবি (সা.) যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন তার বিশেষ দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

১. সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তাই আমরা তাঁর ইবাদত করি। তাঁরই ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করি। আমাদের নিজেদের কৃত অপরাধ এবং কার্যসমূহের নিকৃষ্ট ফলাফল হতে আমরা তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না; আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হিদায়েত করতে পারে না।

২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ (ইলাহ) নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রশংসা। তিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং সবকিছুর ওপরে তিনি সর্বশক্তিমান।

৩. হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলছি, এ বছরের পর এ জায়গায় তোমাদের সাথে আমার আর সাক্ষাৎ না-ও হতে পারে।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

৪. হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের আজকের এ দিন, এ মাস, এ শহর যেমন সকলের জন্য হালাল, পবিত্র ও নিরাপদ, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান তেমনিভাবে পবিত্র, সংরক্ষিত এবং হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত। শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে হাজির হবে এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের প্রভুর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

৫. নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ওই ব্যক্তি যিনি বেশি আল্লাহভীরু। কোনো আরবের ওপর আজমের, অনুরূপ কোনো আজমের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদার কোনো প্রাধান্য নেই।

৬. জাহিলিয়া যুগের যাবতীয় আচার-আচরণ এখন আমার পদযুগলের নিচে। জাহিলিয়া যুগের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। জাহিলিয়া যুগের প্রচলিত কুসিদ প্রথা এবং চক্রবৃদ্ধির সুদজনিত প্রাপ্য বিলুপ্ত করা হলো। এ যুগের অজাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার নিষিদ্ধ করা হলো।

৭. ওহে জনমণ্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপর তাদেরও তেমন অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আর তোমাদের ওপর তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। কেননা তারা তোমাদেরই অংশ। তাদেরকে আল্লাহর আমানতরূপে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে নিয়েছ।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

৮. সমস্ত ঋণ অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। ধার করা সম্পদ ফেরতযোগ্য। দানের প্রতিদান অত্যাবশ্যকীয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার মীমাংসা করবে, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক।

৯. হে জনমণ্ডলী! আমার বক্তব্য শ্রবণ কর ও অনুধাবন কর। মু'মিন একে অপরের ভাই। সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান ছাড়া কারও জন্য অপর ভাইয়ের সম্পদ বৈধ নয়। সুতরাং কেউ কারও প্রতি অবিচার করবে না।

১০. সাবধান হও, অপরাধীর সমস্ত বোঝা অপরাধীকেই বহন করতে হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।

১১. তোমরা দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের নির্যাতন করার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা যা খাবে ও পরবে, তাদেরকেও তা খাওয়াবে ও পরাবে।

১২. তোমারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও অংশীদার করো না, পরস্বপহরণ ও অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না এবং কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।

১৩. জেনে রাখ, সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং দুনিয়ার সমুদয় মুসলিম এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোনো কিছু জোর করে কেড়ে নিতে পারবে না।

১৪. স্মরণ রেখো, বাসভূমি ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমপর্যায়ভুক্ত। আজ হতে বংশগত কৌলীন্য বিলুপ্ত হলো। সে-ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন, যে স্বীয় কার্যের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৫. তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কালাম (কুরআন শরিফ) ও তার প্রেরিত রাসুলের চরিত্রাদর্শ (হাদিস) রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটোর অনুশাসন মেনে চলবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

১৬. আজ এখানে তোমরা যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাগুলো স্মরণ রেখ, আর যারা এখানে উপস্থিত নেই তাদের কাছে পৌছে দিও। হয়তো তাদের মধ্যে আজকের কোনো কোনো শ্রোতার চেয়ে অধিকতর বোধশক্তিসম্পন্ন ও স্মৃতিতে ধরে রাখার মতো ব্যক্তি থাকতে পারে।

১৭. নিশ্চয়ই জেনে রাখ আমার পর আর কোনো নবি নেই। আমিই শেষ নবি।

বিদায় হজের ভাষণ শেষে মুহাম্মদ (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এরপর তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে প্রভু! আমি কি তোমার বাণী পৌছে দিতে পারলাম? আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলাম?" উপস্থিত জনসমুদ্র থেকে আওয়াজ এলো- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পেরেছেন। তখন মহানবি (সা.) পুনরায় বলেন, "হে প্রভু সাক্ষী থাক। এরা বলছে, আমার কতর্ব্য আমি পালন করেছি।" এ সময় কুরআনের শেষ আয়াত নাজিল হলো, "হে মুহাম্মদ (সা.) আজ আমি তোমার দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমার ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমার ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।” (সূরা আল মায়েদা: ৩)। এ আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করে হযরত আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মহানবি (সা.) -এর মিশন শেষ। এখন যেকোনো সময় তার জীবনাবসান ঘটবে।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

মক্কায় হজ পালন শেষে মদিনায় ফেরার পর থেকেই রাসুল (সা.)-এর শরীর ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল। বেশকিছু দিন রোগ ভোগের পর একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন) সোমবার বিকালে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ওফাত লাভ করেন।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

বিদায় হজের ভাষণের উদার, মানবতাবাদী চেতনা ও সমাজ সংস্কারের বিষয়াবলি ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ হজে বিশ্বনবি (সা.) লক্ষাধিক মানুষের সামনে কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত, শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত, অনাগত ভবিষ্যতের সকল মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তাকে অনায়াসে মানবতার মুক্তি সনদ বলা যায়। সাথে সাথে মহানবির (সা.) মুখনিঃসৃত ভাষণটি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভাষণটির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ:

১ . সকল মানুষই সমান: সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। সবাই আদম (আ)-এর বংশধর। আর আদম (আ)-কে কর্দমাক্ত মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা হুজরাতের ১৩নং আয়াতে এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আজ সাদা-কালোতে, আরব-অনারবে, উন্নত বিশ্বের নাগরিকের সাথে অনুন্নত বিশ্বের নাগরিকের দলাদলি-রেষারেষি। বর্ণপ্রথার বিষবাষ্প সমাজকে কলুষিত করে দিচ্ছে- সমাজকে, রাষ্ট্রকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা.) দশম হিজরিতে ঘোষণা দেন যে, সকল মানুষই সমান। কালো-সাদাতে বা আরব-অনারব হওয়াতে আলাদা কোনো মর্যাদা বা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা নেই। একে অপরকে চিনতে ও জানতে আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন বর্ণে, গোত্রে ও জাতিতে বিভক্ত করেছেন।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

২.নারীর অধিকার: মহানবি (সা.) নারীদের অধিকারের বিষয়ে বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপর তাদেরও তেমন অধিকার রয়েছে।" এ থেকে বোঝায় যে, স্ত্রীর ওপর যদি স্বামীর ১০০টি হক থাকে, তাহলে স্বামীর ওপর স্ত্রীর ১০০টি হক রয়েছে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর পোশাকস্বরূপ। মহানবি (সা.) পুরুষদের সতর্ক করে বলেন, "দেখ! তাদেরকে আল্লাহর আমানতরূপে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে নিয়েছ।"

৩. দাসদাসীদের অধিকার দাসদাসী বা অধীনস্থদের সম্পর্কে সতর্ক হতে মহানবি (সা.) নির্দেশ করে বলেন, "তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের নির্যাতন করার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা যা খাবে ও পরবে, তাদেরকেও তা খাওয়াবে ও পরাবে।" এ থেকে ফুটে ওঠে যে, মালিক ও দাসদাসীদের খাবার-দাবার ও পোশাকের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আজ মুসলমানেরা মহানবি (সা.)-এর নির্দেশনা মানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে অথচ দাসদাসী ও অধীনস্থদের প্রতি মহানবি (সা.)-এর এ আদেশের ব্যাপারে সতর্ক নয়। মহানবি (সা.)-এর যেকোনো হুকুম পালন করার মধ্যে পুণ্য (সওয়াব) নিহিত রয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিত- ১. দাসদাসী বা অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

২. উন্নত খাবার পরিবেশন করা। ৩. রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করার সুযোগ দেওয়া। শহরে বা গ্রামে বাসাবাড়িতে বা বাইরে যারা ছোট চাকরি করে, তাদের সাথে আমাদের কীরূপ আচরণ করা উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

৪. অপরাধ যার যার, মানবাধিকার সবার প্রাক-ইসলামি যুগে গোত্রের একজনের অপরাধ, গোটা গোত্রের অপরাধ বলে গণ্য হতো। এজন্য গোত্রে গোত্রে প্রায়ই হানাহানি-রক্তপাত লেগে থাকত। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে, আবার পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না। একজনের অপরাধে অন্যজনকে জেলখানায় আটক করে তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। অপরাধের সংশ্লিষ্টতা না পাওয়া গেলে কারও প্রতি হয়রানি করা যাবে না।

৫ . গোত্রীয় প্রাধান্যের বিলুপ্তি: পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠী এক আদম-হাওয়া থেকে সৃষ্টি। আল্লাহ পাক একে অপর হতে আলাদা করার জন্য বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছেন। জন্মের ওপর কারও হাত নেই বিধায় যা অর্জিত নয়, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি বা আলাদা গুরুত্ব দাবি করা নিরর্থক। ইসলাম ব্যক্তি পরিশ্রমের ফলের ওপর গুরুত্বারোপ করে। মহানবি (সা.) আরব তথা গোটা বিশ্বে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ, বিভক্তি রয়েছে, তার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ব্যক্তি প্রচেষ্টা, সাফল্য, যোগ্যতা, সততা বা দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যে নিজের যোগ্যতা বলে সামনে এগিয়ে যাবে, তাকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

৬. নেতার আনুগত্য বিশ্বনবি (সা.) মুসলমানকে তাদের নেতার প্রতি আনুগত্য দেখাতে আদেশ করেছেন। একজন নেতা বা শাসকের ন্যায়সংগত আদেশ অমান্য করা পাপ। মহানবি (সা.) বলেন, "যদি কোনো বিকলাঙ্গ আবিসিনীয় দাসও তোমাদের আমির নিযুক্ত হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করতে থাকে, তোমরা সর্বতোভাবে তাঁর অনুগত ও বাধ্য থাকবে।" উল্লেখ্য যে, দাস হিসেবে বা বিকলাঙ্গ হিসেবে নেতা বা শাসককে অবহেলা করা যাবে না। প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করা সত্ত্বেও শাসকের আদেশ অমান্য করা দেশদ্রোহী অপরাধের শামিল। মহানবি (সা.)-কে যারা ভালোবাসেন, তাঁর আদেশ-নিষেধ অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করতে চান, তাদের উচিত মহানবি (সা.) -এর এ হুকুম নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা। গীতিম

৭. সুদ প্রথা বাতিল: মূল ঋণের টাকা থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে মূল টাকার অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাকে সুদ বলে। সুদ আর মুনাফা বা লাভ এককথা নয়। সুদ যখন মূল ঋণের টাকার সাথে যুক্ত হয়ে পুঁজি হিসেবে পুনরায় বিনিয়োগ হয় তখন একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে। মহানবি (সা.) যাবতীয় প্রকারের সুদ ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছেন। সুদ খাওয়া হারাম। সুদের টাকা ভোগ করলে ইবাদত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুদের মধ্যে জড়িত থেকে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না। মুসলমানের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামের নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বিদায় হজের ভাষণের উদার, মানবতাবাদী চেতনা ও সমাজ সংস্কারের বিষয়াবলির আলোকে নিজ ও সমাজজীবনে সেসবের প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –১৩ মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক –১৩ মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম। Islam is the complete code of life. মানবজীবনের সকল দিক নিয়ে ইসলাম আলোচনা করে। ইসলামের আদেশ-নিষেধ শুধু একটি দেশ, জাতি বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। ইসলামের আদেশ-নিষেধ কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল জাতির জন্য প্রযোজ্য। মহানবি মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রাসুল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল জাতির, সকল দেশের, সর্বকালের নবি ও রাসুল। মহানবি (সা.) -এর সংস্কারসমূহের আবেদন চিরন্তন। মুজতাহিদগণের (ধর্মীয় গবেষক) দায়িত্ব হলো মহানবি (সা.)-এর যুগের সাথে আধুনিক যুগের সেতু স্থাপন। মহানবি (সা.) -এর সংস্কৃতির কাছাকাছি নিজের সংস্কৃতিকে নিয়ে যাওয়াই মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। ইসলামি যুগের আদর্শ আঁকড়ে ধরার মধ্যে মানবজীবনের মুক্তি। এজন্যই মহানবি (সা.) -এর সংস্কারগুলো আমাদের জানা দরকার এবং আমাদের জীবনে কোনো অসংগতি থাকলে তা দ্রুত সংস্কারপূর্বক ইসলামি সমাজে ফিরে যাওয়া উচিত।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

সামাজিক সংস্কার

যেকোনো দেশ বা জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত সমাজের স্থিতিশীলতা। সমাজের শৃঙ্খলা ও ন্যায়বোধ থেকে শান্তির উৎপত্তি। সমাজ যদি অসৎ হয় এবং সামাজিক কাঠামো যদি ভঙ্গুর হয় তাহলে সেই সমাজে মানসিক প্রশান্তি থাকতে পারে না। ন্যায়পরায়ণতা ও সততা থেকে সামাজিক দর্শন তৈরি হওয়া দরকার। মহানবি (সা.) এমন একটি ইসলামি সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণ করেছিলেন যা ছিল ইনসাফভিত্তিক ও নারী-পুরুষের অংশীদারিভিত্তিক। ইসলাম ছিল তার মূলমন্ত্র। ঘুণে ধরা আইনের পরিবর্তে স্থাপিত হয় ইসলামি আইন। নিম্নলিখিতভাবে সমাজে ইসলামিকরণের দিকগুলো তুলে ধরা হলো-

গোত্রপ্রীতির সমাজের সদস্য: প্রাক-ইসলামি যুগে রক্ত ছিল সমাজের সদস্য হওয়ার অন্যতম শর্ত। এক গোত্র বা বংশের সাথে অন্য গোত্র বা বংশের সদস্যের মিশ্রণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গোত্রের প্রতি সদস্যদের ছিল সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য। ফলে বৃহৎ স্বার্থে গোত্রগুলো একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত না। এতে মানবকল্যাণ ব্যাহত হতো। মহানবি (সা.) এ প্রথার আমূল পরিবর্তন করেন। মহানবি (সা.) রক্তের পরিবর্তে ধর্মকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে এ সমাজের বহুমাত্রিকতা বিদ্যমান ছিল। মহানবি (সা.) এমন একটি সমাজব্যবস্থার পত্তন করেন, যে সমাজের সদস্য হওয়ার সুযোগ ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। মানব সন্তান হওয়াই ছিল এ অন্যতম যোগ্যতা। পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও সততার ফলে অন্য যেকোনো ধর্মাবলম্বী ইসলামি সমাজের সদস্য হতে পারত। মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত সমাজে আঞ্চলিকতাবোধ বা বর্ণপ্রথা বিদ্যমান ছিল না। যেহেতু সকল মানবের উৎস ছিলেন হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)। এ সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বাড়াবাড়ি ছিল না।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

সামাজিক সংস্কার

নারী অধিকার: নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ইসলামি সমাজ নারীর ব্যাপারে অত্যন্ত উদার, মানবিক ও সহানুভূতিপ্রবণ। প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা কীরূপ ছিল, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা নাহলের ৫৮-৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কত নিকৃষ্ট।" এই ছিল নারীদের সার্বিক চিত্র। মহানবি (সা.) আল্লাহর নির্দেশে নারীদের পুরুষের সমমর্যাদায় নিয়ে আসেন। আল্লাহ পাক সূরা বাকারা ২২৮নং আয়াতে এসেছে, "স্ত্রীর ওপর পুরুষদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি পুরুষদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার আছে।" হাদিসেও নারীদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রাসুল বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।"

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

সামাজিক সংস্কার

জাহিলিয়া যুগে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা ছিল না। মহানবি (সা.) ইসলামি মতে বিবাহকে সংস্কার করেন। প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন নারীর স্বেচ্ছাসম্মতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। আল্লাহ পাক বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মানবের জৈবিক দিকটির স্বীকৃতি দিলেন এবং এর যথাযথ মর্যাদা দিলেন। ইসলামি আইনে নারী-পুরুষের মতোই একটি স্বাধীন সত্তা। সে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক, আর্থিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যেতে পারে যে, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম আমূল সংস্কার করেছে। নারীসমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবি (সা.) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

সামাজিক সংস্কার

নারীরা যেন পুরুষদের খেলার পুতুল, ভোগবিলাসের বস্তু না হয় তার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে পার্থিব ফায়দা হাসিল করে তাদের যেন সামাজিক অবমাননা না করা হয়, এর প্রতি কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বিবাহে তালাকের ব্যবস্থা, বিবাহকালীন মোহরানা প্রদানের ব্যবস্থা করে যৌনজীবনকে সুপথে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। ইসলামি উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করে মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, দাদি, নাতনি ইত্যাদি নারীদের ন্যায্য পাওনার অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পর্দাপ্রথা চালু করে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পরকীয়া প্রেম, ব্যভিচার ও অন্যান্য নারীঘটিত পাপাচার হতে সমাজকে কলুষমুক্ত করেন এবং সাথে সাথে নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন। কন্যাসন্তান জন্মলাভ করার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার প্রথম সন্তান মেয়ে।" এভাবে তিনি নারীদের সমাজে নবমর্যাদায় প্রতিস্থাপন করলেন। সাধারণত পরাজিত শত্রুদলের যুদ্ধবন্দিদের দাসদাসীতে পরিণত করা হতো। গবাদি পশুর ন্যায় দাসদাসীদেরও বাজারে বিক্রি হতো। মনিবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসদাসীদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে হযরত আম্মার (রা.), বেলাল (রা.) ও মুহাইব (রা.) প্রমুখ ক্রীতদাস সাহাবিকে অমানুষিক ও নির্মম কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। ইসলাম প্রত্যেক দাসদাসীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে রক্ষাকবচ হিসেবে এগিয়ে এসেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজের ভাষণে দাসদাসীদের প্রতি সদয় হওয়ার জোর তাগিদ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) দাসদাসীদের সমাজে পুনর্বাসন করে দিয়েছেন। জায়েদ ইবনে হারিস এবং উসামা ইবনে জায়েদকে সেনাপতি এবং হযরত বেলাল (রা.)-কে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে মনোনীত করেছেন।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

সামাজিক সংস্কার

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ: ষষ্ঠ শতাব্দীর আরবসমাজকে তিনি ইসলামের মহান আদর্শ দিয়ে পরিপূর্ণভাবে পাল্টে দেন। তিনি ধনি-গরিব, উঁচু-নীচু, ছোট-বড় সকল ভেদাভেদ ভুলে এমন একটি সমাজব্যবস্থা কায়েম করেন যার মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ। তিনি ঘোষণা দিলেন, "সকল মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী।" তিনি আভিজাত্যের গৌরব, কৌলীন্য প্রথা, বংশমর্যাদা ইত্যাদি দূর করে ইনসাফভিত্তিক, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ বিশ্বনবি (সা.) শ্রমিক ও মজুরদের অধিকার আদায়ের দাবি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। উপযুক্ত মজুরি তাদের ভাগ্যে জুটত না। সামাজিকভাবে শ্রমিকরা ছিল নিগৃহীত। হুজুর (সা.) শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "ঘাম শুকাবার আগেই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে হবে।" তিনি আরও বলতেন, "ফরজ ইবাদতের পর হালাল রোজগার করাও ফরজ।"

ইয়াতিম, অসহায়দেরও মর্যাদা: ইসলামের মতাদর্শে ধনি-দরিদ্রের ভেদাভেদ অযৌক্তিক, প্রকৃত মর্যাদা মূল্যায়নের মানদণ্ড হলো মানুষের গুণাবলি ও তার সত্যনিষ্ঠা। দরিদ্রদের তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন, তিনি দোয়া করতেন "হে আল্লাহ আমাকে - দরিদ্রাবস্থায় জীবিত রাখ, দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যু দিও এবং দরিদ্রদের সাথে আমার হাশর করিও।" তবে দারিদ্র্য নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "দাতার হাত গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম।" ওই জীবিকাই সর্বোৎকৃষ্ট, যা মানুষ নিজ হাতে উপার্জন করে।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

ধর্মীয় সংস্কার

মহনবি (সা.) -এর আবির্ভাবকালীন ও তাঁর পূর্বে বিশ্বের সর্বত্র ধর্মীয় অবস্থা ছিল শোচনীয়। কোথাও একত্ববাদের শিক্ষা কার্যকর ছিল না। ব্যক্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা, জড় পূজা ও কল্পিত দেবদেবীর পূজা চলছিল সর্বত্র। জাহিলিয়াতে তাণ্ডবলীলায় সর্বত্র মানবতার চির উন্নত শির তুচ্ছ জিনিসের পদমূলে নত হচ্ছিল। মানবতার এহেন শোচনীয় অবস্থার যুগসন্ধিক্ষণে মহান আল্লাহ মহানবি (সা.)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন। মহানবি (সা.) ধর্মীয় সংস্কারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১. একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা: সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে মহান আল্লাহ একত্ববাদের শিক্ষা পৃথিবীর কোথাও ছিল না। মহানবি (সা.) বিশ্ববাসীকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।"

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, পালনকারী, রক্ষাকর্তা, সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির নিরঙ্কুশ অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ। মহানবি (সা.)-কে আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "আপনি বলুন, আল্লাহ একক সত্তা। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।"

৩. পৌত্তলিকতার অবসান: মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসী বিভিন্ন ধরনের মূর্তিপূজা ও সৌরপূজায় লিপ্ত ছিল।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

ধর্মীয় সংস্কার

৪. ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিবর্তন: অজ্ঞতার যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল- সমাজে যারাই প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান, বিত্তশালী, তারাই শ্রেষ্ঠ, তারাই সম্মানিত। তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। মহানবি (সা.) তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অবসানকল্পে কুরআনের বাণী শোনালেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু।“

৫. যাজকতন্ত্রের অবসান: অন্ধকার যুগে লোকদের ধারণা ছিল, জান্নাতের চাবিকাঠি একমাত্র ধর্মযাজকদের হাতে। তাদের খুশি করতে পারলে যত পাপই করা হোক না কেন জান্নাতে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। এসব ধারণার অবসান ঘটিয়ে মহানবি (সা.) আল্লাহর বাণী ঘোষণা করেন, “সেদিন কেউ কারও কোনো উপকারে আসবে না। একে অন্যের কোনো বোঝাও গ্রহণ করবে না। এমনকি কেউ কারও জন্য কোনোরূপ সুপারিশ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।"

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

ধর্মীয় সংস্কার

৬. জন্মান্তরবাদ ধারণার পরিবর্তন ও আখিরাতের ধারণা: মহানবি (সা.) অজ্ঞযুগের আরেকটি ভ্রান্ত বিশ্বাস 'জন্মান্তরবাদ' তথা 'মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে পৃথিবীতে পূর্বকৃত কর্মফল ভোগ করার জন্য আগমন করবে'- এ ধারণা বিদূরিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "কোনো মানুষই মৃত্যুর পর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না; বরং শেষ বিচার দিবসে হিসাব দেওয়ার জন্য পুনরুত্থিত হবে এবং স্বীয় কর্মফল অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামে অনন্তকাল অবস্থান করবে।"

৭. সকল নবি-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস: মহানবি (সা.) শিক্ষা দিলেন, মানবতার মুক্তির পক্ষে ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগে অগণিত নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। সকল নবি-রাসুলের প্রতি সমানভাবে ইমান আনতে হবে। তিনি পবিত্র কুরআনের ঘোষণা শোনালেন, "আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।"

৮. ইসলামি শরিয়তের শিক্ষা: মহানবি (সা.) মানুষকে জীবনব্যাপী আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যাপৃত থাকার শিক্ষা দেন। ইসলামি শরিয়তের মূল শিক্ষা কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত সম্পর্কে শিক্ষা দেন। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের বিধান চালু করেন।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

রাজনৈতিক সংস্কার

পূর্ণ মনোভাব, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল যাঁর চরিত্রের ভূষণ, যিনি ছিলেন একাধারে ইয়াতিম হিসেবে সবার স্নেহের পাত্র, স্বামী হিসেবে প্রেমময়, পিতা হিসেবে স্নেহের আধার, সঙ্গী হিসেবে বিশ্বস্ত, যিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, দূরদর্শী সংস্কারক, ন্যায় বিচারক, মঞ্চ রাজনীতিবিদ এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক, তিনি হলেন সর্বকালের, সর্বযুগের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)। ৬২২ সালে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর মদিনায় ইসলামি আন্দোলনের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। মদিনাবাসিগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর কর্মপদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। এতদিন মক্কায় ইসলাম ছিল কেবল একটি ধর্মের নাম কিন্তু মদিনায় এসে তিনি দৃঢ় ভিত্তির ওপর ইসলামি রাষ্ট্র গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মুহাম্মদ (সা.) মনে করেছিলেন, সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সনদপত্রও স্বাক্ষরিত হয়, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধান। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার, জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়। মুহাম্মদ (সা.) হন ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সভাপতি। তিনি যে একজন দূরদর্শী ও সফল রাজনীতিবিদ এখানেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মদিনা সনদ নাগরিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

রাজনৈতিক সংস্কার

শ্রেণিপেশার মানুষের ইসলামি ভাবধারায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন। সে লক্ষ্যে তিনি আমরণ অবিচলভাবে কাজ করে গেছেন এবং সফল হয়েছেন। এজন্য তাঁকে গোত্রপ্রীতির পরিবর্তে ইসলামপ্রীতি, প্রতিষ্ঠা ও আরব-অনারব দ্বন্দ্ব দূরীকরণ করতে হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণ করেন। গোটা আরবকে তিনি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এর জন্য পৃথক পৃথক শাসক নিয়োগ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করেন।

মসজিদে নববিকে তিনি ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সচিবালয় হিসেবে মনোনীত করেন। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "Thus by one stroke the most vital bond of Arab relationship that of tribal kinship, was replaced by new bond, that of faith." অর্থাৎ "আরব জাতির একমাত্র বন্ধন গোত্রপ্রীতি, একটি মাত্র আঘাতেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ইমান এর স্থান দখল করে নিল।" মদিনা, খায়বার, মক্কা, তায়েফ, তায়মা, সানা, ইয়ামেন, হাজরামাউত, ওমান ও বাহরাইন ছিল তখনকার এক একটি প্রদেশ। প্রাদেশিক শাসককে ওয়ালি বলা হতো। ওয়ালি ছিলেন একাধারে শাসক, বিচারক, সেনাপতি।

পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর শাসনামলে যেকোনো ব্যক্তি তাদের মৌলিক অধিকার লাভ করত। বাক ও বিবেকের স্বাধীনতা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রয়োজনে একজন সাধারণ নাগরিকও প্রশাসনের যেকোনো স্তরের সমালোচনা করতে পারত। ইহুদি, বেদুইন, যাযাবর সকলেই নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

অর্থনৈতিক সংস্কার

আইয়ামে জাহিলিয়া যুগে পশুপালন, লুটতরাজ ও চড়া হারে সুদ প্রথা ছিল অর্থনীতির প্রাণ। সীমিত আকারে ব্যবসায় বাণিজ্য করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পাঁচ প্রকার রাজস্ব আয়ের উৎস প্রবর্তন করেন- (ক) যাকাত, (খ) খারাজ, (সা.) গনিমত, (ঘ) জিজিয়া ও (৬) আলফে।

যাকাত : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত। যাকাত আরবি শব্দ। এর অর্থ শুদ্ধি বা পরিশোধক এবং বৃদ্ধি বা পরিবর্ধক।

যদি কোনো মুসলমান নরনারী সারা বছরের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে বছর শেষে নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয় এবং তা পূর্ণ এক বছর তার কাছে সঞ্চিত থাকে তবে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত খাতে দান করাকে 'যাকাত' বলে। যাকাত দেওয়া ফরজ। যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন। ইমান ও সালাতের পরেই এর স্থান। যাকাত যে ফরজ তা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

খারাজ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় খারাজ ভূমি ছিল অতি অল্প। এটি অমুসলিম কৃষকদের ওপর ধার্য করা হতো।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

অর্থনৈতিক সংস্কার

আল গনিমত: যুদ্ধে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিকে বলা হতো গনিমত। এর ১/৫ ভাগ রাজকোষে (বায়তুল মালে) জমা হতো এবং বাকি ৪/৫ অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হতো। ৪/৫ ভাগের মধ্যে অশ্বারোহীরা পদাতিক থেকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ পেত। অবশিষ্ট ১/৫ ভাগের মধ্যে ১/৩ অংশ হযরত মুহাম্মদ (সা.), ১/৩ অংশ তাঁর পরিবারের জন্য এবং ১/৩ অংশ অনাথদের জন্য ব্যয় করা হতো।

জিজিয়া: অমুসলিমদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নিরাপত্তা করকে জিজিয়া কর বলে। কারণ হলো দেশরক্ষার জন্য মুসলিমদের যুদ্ধে যাওয়ার বাধ্যতামূলক ছিল কিন্তু জিজিয়ার বিনিময়ে অমুসলিমদের এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। অপ্রকৃতিস্থ, শিশু, অসুস্থ, দরিদ্র, ধর্মযাজকদের জিজিয়া হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর সাজসজ্জা, রসদ ও বেতন বাবদ জিজিয়ার অর্থ খরচ করা হতো।

আল ফে: দাবিদারহীন খাসজমি, বিদ্রোহীদের নিকট হতে বাজেয়াপ্ত জমি, অনাবাদি ও অরণ্যভূমি 'আল ফে' নামে অভিহিত হতো। এরূপ জমি সংগৃহীত আয় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হতো। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ কর্তৃক ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল সাদকাতুল ফিতর, আওকাফ, আমওয়াল, আলফাদিলা, নাওয়াইব, দান, মুক্তিপণ, কর্জ উপঢৌকন সামগ্রী ইত্যাদি।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

প্রশাসনিক সংস্কার

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সংবিধান হচ্ছে 'মদিনা সনদ'। এ সংবিধানের আলোকে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবি (সা.) -এর দূরদর্শিতার ফলে মদিনায় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা, রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিচার ব্যবস্থা সংস্করণ, সামরিক প্রশাসন গঠন, ধর্ম প্রচার প্রভৃতির প্রচলন ঘটে।

১. সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: নবি করিম (সা.) সর্বপ্রথম মদিনা মসজিদে সচিবালয় স্থাপন করেন। তাঁর বিশ্বস্ত সচিবের নাম দেওয়া হয় 'কাতিব'। নবি করিম (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহি বা ঐশী বাণী সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য সেগুলো লিপিবদ্ধ করাতে সাহাবিদের নির্দেশ দেন। যাঁরা নবি করিম (সা.) -এর নির্দেশ প্রাপ্ত ওহি লিখে রাখতেন তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), উবায় বিন কা'ব (রা.), জায়েদ বিন সাবিত (রা.) অন্যতম ছিলেন। এরূপ কয়েকজনের মধ্যে আল জুবাইর বিন সাবিত (রা.) এবং আল জুহাইর বিন আল ইয়ামান (রা.) খেজুরগাছ থেকে প্রাপ্ত আয়ের হিসাব রাখতেন। রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব রাখতেন মুয়ানকির বিন আবি তাতেমা। আল-মুগিরা বিন শুবা (রা.) এবং হুসায়েন বিন নুমির বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে সখ্য বজায় রাখতেন। জলাশয়, আনসার পুরুষ ও রমণীর হিসাব রাখতেন আবদুল্লাহ বিন আরকাম (রা.) এবং আল আলা বিন উকবা (রা.)।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

প্রশাসনিক সংস্কার

২. প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা: নবি করিম (সা.) সুষ্ঠু ও কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'ওয়ালি' নামে পরিচিত ছিলেন। নবি করিম (সা.)-এর সময় মদিনা ছাড়া অন্য প্রদেশগুলো হলো- মক্কা, তায়েফ, সানা, ইয়েমেন, হাজরামাউত, ওমান, বাহরাইন, আল জানদ, খাইবার ও বানু কিন্দা। বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে মুয়াজ বিন জাবাল ইয়েমেনে, জিয়াদ বিন লাবিদ হাজরামাউতে, ইয়ালা বিন উমাইয়া আল জানদে, আলা বিন হাজরামি বাহরাইনের ওয়ালি নিযুক্ত হন। এছাড়াও নবি করিম (সা.) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল শাসনের জন্য 'আমিল' নিয়োগ করেন। আমিলদের প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয় সুষ্ঠুভাবে কর আদায় করা।

৩. সামরিক প্রশাসন: রাসুল (সা.) সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহানবি (সা.)-এর নেতৃত্বে সর্বমোট ২৭টি যুদ্ধ পরিচালিত হয়। একমাত্র উহুদের যুদ্ধে নবি করিম (সা.) -এর নির্দেশ অমান্য করায় মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটে। এছাড়া সব যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী শৌর্যবীর্যের সাথে যুদ্ধ করে ইসলামের পতাকাকে সমুজ্জ্বল করে।

মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ

প্রশাসনিক সংস্কার

৪. বিচারব্যবস্থা: প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আদালতের প্রধান হাকিম। যেকোনো অভিযোগ আগে গোত্রপতির দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করা হতো। বাদী ও বিবাদী ভিন্ন গোত্রের হলেও উভয় গোত্রের আইন বিশারদদের সহায়তায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আইন হচ্ছে নৈতিকতা ও চরিত্রের প্রহরী, চরিত্র ও নৈতিকতা হচ্ছে আইনের রক্ষক। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন। তাঁর নিকট বাণিজ্যিক, বিবাহ-শাদি ও তালাক, দিওয়ানি মামলা উপস্থাপিত হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা.) একই সময়ে আখলাকের শিক্ষক এবং আইন প্রণেতা নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধ সম্পর্কিত সমস্যাদি এবং প্রথমে কুরআন এবং পরে নিজের বিবেক ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আইনকানুন সম্পর্কে দুটি বৃহৎ অংশে ভাগ করা হয়- (ক) ব্যক্তিগত আইন (Private Law) ও (খ) সামাজিক আইন (Public Law) ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে মুসলিম ফকিহগণ লেনদেন, শাস্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি, উত্তরাধিকার, ওয়াসিয়্যাতকে শামিল করেন। সামাজিক বা সরকারি আইনসমূহের মধ্যে সংবিধান এবং বৈদেশিক আইনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সামরিক সম্পর্ক।

৫. চিকিৎসা বিভাগ: মহানবি (সা.) জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। হারিস ইবনে সালাহ এবং তাঁর পুত্র তাবিয়ের ছিলেন সে সময়ের নামকরা চিকিৎসক।

৬. পরিসংখ্যান বিভাগ: মহানবি (সা.) তাঁর শাসনামলে আরব দেশে দুইবার আদম শুমারি করেন। রেজিস্টারে সাল, নাগরিকের নাম, ঠিকানা ও পদবি লিপিবদ্ধ ছিল।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০২ : হযরত মুহাম্মদ (স.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

টপিক –১৪ মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)
টপিক ০২: হিজরতঃ কারণ ও গুরুত্ব
টপিক ০৩: মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব
টপিক ০৪: বদর যুদ্ধ (১৭ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৫: উহুদ যুদ্ধ (২১শে মার্চ, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৬: খন্দক যুদ্ধ (মার্চ-এপ্রিল ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ০৭: হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
টপিক ০৮: হুদাইবিয়ার সন্ধি ও এর ফল
টপিক ০৯: খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১০: মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ)
টপিক ১১: মক্কা বিজয় ও শান্তিনীতি
টপিক ১২: বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ
টপিক ১৩: মহানবি (স.)-এর সংস্কারসমূহ
টপিক ১৪: মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

টপিক –১৪ মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর বান্দা এবং নবি ও রাসুল। মহানবি (সা.) -এর চরিত্র সম্পর্কে এ সৌরজগতের মালিক আল্লাহ পাক প্রশংসাপত্র (চারিত্রিক সনদপত্র) দিয়েছেন। আল্লাহ পাক সূরা কালামের ৪নং আয়াতে বলেন, "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" এতে বোঝা যায়, আজ থেকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত উম্মত আসবে, তাদের সকলের চরিত্র হওয়া উচিত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্রের অনুরূপ। যিনি যত বেশি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র নিজের মধ্যে ধারণ ও লালন করতে পারবেন, তিনি তত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবেন এবং আল্লাহর অলী বলে পরিগণিত হবে। বুখারি শরীফের একটি হাদিসে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র হলো আল কুরআন।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ

পূর্ণাঙ্গ মানবীয় গুণাবলিতে সমৃদ্ধ ছিলেন বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা.)। এজন্য কামিল (পূর্ণাঙ্গ) বলা হয়। তিনি শুধু মানবজাতির নয়, জীব, জড়, পশুপাখি তথা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ছিলেন রহমতস্বরূপ। তিনি শুধু মুসলিমদের নবি নয়, তিনি সর্বকালের সকল জাতির নবি। মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রতি মুহাম্মদ (সা.)-এর সমান দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর নিকট কালো-ধলো, ধনী-গরিব, নরনারী, ফকির-বাদশাহ, কুলি-মজুর, মালিক-শ্রমিকের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মহানবি (সা.) -এর উদারতা ছিল চিত্তাকর্ষক। তিনি শ্রোতার অন্তর্দর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। এ হিসেবে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন। (সূরা আলে ইমরান ১৫৯নং আয়াত) মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অত্যন্ত উন্নত, মহান ও মহীয়ান। তাই ইসলামি জীবনদর্শনে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের স্থান ও গুরুত্ব অতি উচ্চে। মহানবি (সা.)-এর প্রশংসায় আল্লাহপাক বলেন, "নিশ্চয়ই আপনি অতি মহান চরিত্র গুণে ভূষিত হয়েছে।" যে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে মহানবি (সা.) স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রশংসা করেছেন, সেই চরিত্র গুণ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ

মহানবি (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও ধনদৌলতের দিকে তাকান না, তিনি দেখেন তোমাদের মনের অবস্থা ও কাজকর্ম।" তিনি এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক সূরা হজের ৩৭নং আয়াতে বলেন, "আল্লাহর নিকট পৌছায় না এর গোশত ও রক্ত, পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।" মহানবি (সা.) বলেছেন, "মানুষের আমলগুলো যখন ওজন করা হবে, তখন সৎ স্বভাবের ওজন বেশি হবে।" মহানবি (সা.) নিজের ব্যাপারে বলেছেন, "আমাকে নৈতিক চরিত্র-মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ করে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।" ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। নৈতিকতা ইসলামির ব্যবস্থায় মৌলিক ভিত্তি। ইসলামের গোটা

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ

জীবনব্যবস্থার কাঠামো ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে নৈতিকতার ওপর। ইসলামি জীবনব্যবস্থার দুটি দিক রয়েছে। যথা- (ক) নৈতিক দিক ও (খ) আইনগত দিক। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর আসে আইনগত দিক। ইসলাম তথা মহানবি (সা.) মানবজাতির ষড়রিপুকে বৈধ পথে পরিচালিত করেন। ইসলাম মনে কখনো কুচিন্তা উদিত হতে দিতে চায় না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সবার চেয়ে হৃদয়ে খোদাভীতিকে বেশি স্থান দিতেন। কারণ হৃদয়ে যদি খোদাভীতি থাকে, তাহলে তার দ্বারা সমাজের অনিষ্ট হতে পারে না। এজন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রার্থনায় বলতেন, "হে আল্লাহ, আমাকে নূর দান কর, আমার নূরকে আরও বৃদ্ধি করে দাও। আমার আত্মায় নূর দাও, আমার জবানে নূর দাও, আমার শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তিতে নূর দাও, আমার পশমে, রক্ত-মাংস ও অস্থিতে নূর দাও।”

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

পবিত্র কুরআন শরিফের সুরা আম্বিয়ার ১০৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হে হাবিব! আপনাকে বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" মহানবি (সা.) মানব, জ্বিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সকলের জন্যই রহমতস্বরূপ। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ও ইবাদত তাঁর চেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আরবে যখন সামাজিক জীবনে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ইত্যাদির বিষফল ছেয়ে গিয়েছিল, তখন বিশ্বনবি (সা.) সকল বৈষম্য, হানাহানি, সামাজিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, সংহতি, ন্যায় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সৌধের ওপর ইসলামি সমাজ গঠন করেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী যথার্থভাবে মন্তব্য করেন, "Never in the history of the world was need so great, the time so ripe, for the appearance of a Deliveres."

আউস ও খাযরাজ গোত্রের দ্বন্দ্ব নিরসন: আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বহু বছর হতে যুদ্ধ লেগেছিল। তারা মহানবি (সা.)-কে মদিনায় হিজরতের আমন্ত্রণ জানান। মহানবি (সা.) তাদের বহুদিনের যুদ্ধবিগ্রহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মিটিয়ে দেন। তাঁর এ মীমাংসা স্থায়ী হয়েছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য মহানবি (সা.) ইসলাম গ্রহণের শর্ত জুড়ে দেননি। মানুষের উপকার করা, মানুষের মধ্যে নিজের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

মদিনা সনদ: মদিনা সনদ ছিল মহানবি (সা.) -এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের নিরলস প্রয়াস ও উদ্যোগ। মদিনায় তখন মুহাজির, আনসার, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোক বাস করত। সকল ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সম্প্রীতি, সম্ভাব, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা সকল জাতের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এ নীতির সকলেই প্রশংসা করেছেন। যেমন-

বদর যুদ্ধোত্তর উদারতা: ইসলাম যখন সুসংহত ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠার পথে তখন মক্কার কুরাইশরা বদর প্রান্তরে মুসলিমদের আঘাত করে। অসামান্য সাহস, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারের মাধ্যমে মুসলিমরা বিজয়ী হয়। বিজয়ী হওয়ার পরও মুহাম্মদ (সা.) -এর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। মক্কা জীবনের নির্যাতন ভুলে তিনি আদেশ করলেন, "বন্দিদের প্রতি ভালো ব্যবহার কর।" তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। আর আদেশ পালনের সাথে সাথে গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা যুক্ত হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর পথে তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, কিন্তু তোমরা কখনই আক্রমণকারী হবে না। অবশ্যই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" সূরা বাকারা: আয়াত ১৯০।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

হুদাইবিয়ার সন্ধি: মক্কার কুরাইশরা ছিল অমুসলিম। মহানবি (সা.) অমুসলিমদের সাথে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে সন্ধি করেন। এ সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যিকভাবে দেখলে দেখা যায় সব শর্তগুলো মুসলিমদের বিপক্ষে। হযরত আলী (রা.) ছিলেন এ সন্ধির লেখক। অমুসলিমদের আপত্তির কারণে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব জানা যায়।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

মক্কা বিজয়োত্তর সম্প্রীতি ও সংহতির দৃষ্টান্ত: মহানবি (সা.) যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন বলেই বিনাযুদ্ধে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় সফল হয়। মক্কাবাসীরা ছিল পরাজিত। তাদের মনে ছিল শাস্তির আশঙ্কা। কিন্তু মহানবি (সা.) তাদের ক্ষমা করে দিলেন। ইসলাম গ্রহণ করাকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেননি। অমুসলিমদের প্রতি সম্প্রীতি ও সংহতি বজায় রাখার জন্য তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা জীবন ও মদিনা জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যেখানে তিনি অমুসলিমদের প্রতি সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও সংহতি বজায় রেখেছেন। মহানবি (সা.) সাহাবিদের অমুসলিম মা-বাবাদের সাথে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও অমুসলিম দুধমা বাবা ও ভাই-বোনদের শ্রদ্ধা করেছেন। মহানবি (সা.)-এর উম্মত হিসেবে আমাদের তাঁর এসব আদর্শ ধারণ ও লালন করা উচিত।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

নারীর প্রতি সম্মানবোধ

সূরা নাহলের ৫৮নং আয়াতে নারীদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ দেওয়া হতো, তখন তার চেহারা হয়ে যেত কালো, আর সে হয়ে পড়ত ক্লিষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন।" আজকের যুগেও অনেকে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠের সংবাদ পেয়ে মুখ কালো করেন।

মহানবি (সা.) -এর আগমন নারীদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ পাক নারী-পুরুষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না রেখে সমান মর্যাদা দান করেন। "নারী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা ইমানদার হয়ে সৎকাজ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" সূরা মুমিন: আয়াত ৪০। এখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য না করে তাকওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা এমনই বর্বর ছিল যে, তারা নারী জাতিকে ঘৃণিত পণ্য মনে করত। পিতামাতার সাথে মন্দ আচরণ করতে তারা একটুও কুণ্ঠাবোধ করত না এবং আত্মীয়দের খোঁজখবর নিত না। মহানবি (সা.) এসব ধ্যানধারণার মূলোৎপাটন করে বলেন যে, পিতামাতা সকলের পরম শ্রদ্ধার পাত্র, পিতামাতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টির মাপকাঠি। পরিবার হলো সমাজের মূলভিত্তি ও প্রাথমিক সংগঠন। মহানবি (সা.) প্রথমেই পরিবার থেকে নারীদের সম্মান করার শিক্ষা দেন। পরিবারই হলো প্রথম শিক্ষালয়।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

নারীর প্রতি সম্মানবোধ

পরিবারে পিতামাতার মর্যাদা নির্ধারণ করতে গিয়ে আল্লাহ পাক সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ ও ২৪নং আয়াতে বলেন, "তোমার আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে আর পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়জন বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বেদনাদায়ক কোনো শব্দ (উহ্) বল না, তাদের ধমক দিও না। বরং তাদের সাথে নরম কথা বল। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেক এবং বল, হে আমার রব, পিতামাতার প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।"

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

নারীর প্রতি সম্মানবোধ

সূরা লুকমানে বলা হয়েছে, "আমি তো মানুষকে মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে বহু কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং দুধ ছাড়াতে লেগেছে দুই বছর। সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর।" তাফসীরকারকগণের মতে, মা-বাবার খেদমত করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব। অন্য একটি হাদিসে মা-বাবার খেদমত না করাকে কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে। মা-বাবা উভয়কে নিজ জীবদ্দশায় পেয়ে তাদের খেদমত করে সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতে না যেতে পারাকে মহানবি (সা.) দুর্ভাগা বলে অভিহিত করেছেন। জনৈক সাহাবি পর পর তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তিনি কার সাথে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করবেন- মহানবি (সা.) তিনবারই মায়ের কথা বলেছিলেন এবং চতুর্থবার প্রশ্নের উত্তরে বাবার কথা বলেছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে মা, কন্যা, স্ত্রীকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে। বিবাহে স্বামীদের স্ত্রীদের মোহরানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে পরিবারে নারীদের সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাদের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, মহানবি (সা.) নারীদের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য। মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত নারীনীতিই শরিয়ত। তাঁর প্রদত্ত নারীনীতিই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ নারীনীতিই বাস্তবসম্মত।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

মহানবি (স.)-এর উদার দৃষ্টিভঙ্গি

মহানবি (সা.) -এর জীবনের সকল কর্মতৎপরতা ও তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতিটি অলিগলি বিশ্লেষণ করলে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মহানবি (সা.) হারবুল ফুজ্জারের নিষ্ঠুরতায় ৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে নিঃস্বার্থ উদারপন্থি, মানবদরদি ও উৎসাহী আরবদের নিয়ে হিলফুল ফুজুল নামে বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কল্যাণমুখী সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘের কর্মসূচি হতে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। যেমন-

১. এতিম, নিঃস্ব, অসহায় ও দুস্থদেরকে সেবা করব।
২. আমরা অত্যাচারীকে বাধা দিব।
৩. উৎপীড়িতকে সাহায্য করব।
৪. দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করব।
৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করব।

মহানবি (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব

মহানবি (স.)-এর উদার দৃষ্টিভঙ্গি

একদিকে মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন এবং অপরদিকে মহানবি (সা.)-এর উদারতার পরীক্ষা চলতে থাকে। অবশেষে তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মহানবি (সা.) তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তায়েফ গমন করেছিলেন। তায়েফবাসী (কয়েকজন ব্যতীত) মানবতার মুক্তির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং মহানবি (সা.) ও তাঁর দলের পিছনে শিশুদের লেলিয়ে দেয়। মহানবি (সা.) শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। শারীরিক ও মানসিক আঘাত পেয়েও মহানবি (সা.) তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করেননি। তাঁর এমনই উদারতা ছিল যে, তাঁর মনে বিন্দু পরিমাণ প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক, ও মুসলিমদের সমন্বয়ে যে সনদ প্রণয়ন করেছিলেন, তা বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। বৃহত্তর মানবকল্যাণে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে কীভাবে একটি উত্তম সংবিধান রচিত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসক ও নেতাগণ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আনুগত্যের ব্যাপারে সুনাগরিকদের ও মদিনা সনদ হতে শিক্ষা নিতে হবে। বদর যুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে মহানবি (সা.) যে উদারতা দেখান, তা বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। বন্দিদের কাউকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত করা হয়নি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার নীতিমালার চেয়েও উদার ও মানবিক আচরণ করা হয়েছিল। কিছু মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল না

মহানবি (স.)-এর উদার দৃষ্টিভঙ্গি

তারা শ্রমের মূল্যে মুক্তি পেয়েছিলেন। শিক্ষিত বন্দিরা বিদ্যা শিক্ষাদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করেছিলেন। এ থেকে বিদ্যা অর্জন করার গুরুত্ব পাওয়া যায়। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত লেখার সময় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ও 'রাসুলুল্লাহ' শব্দ চয়নে কুরাইশদের পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে। উদারতার প্রতীক মহানবি (সা.) কুরাইশদের পছন্দমাফিক শব্দ চয়ন করার সুযোগ দেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয়োত্তর উদারতা প্রদর্শনের দৃশ্য ছিল স্বর্গীয়। মহানবি (সা.)-এর দয়ার্দ্র হৃদয় ও ক্ষমাশীল মন মক্কাবাসীদের অতীত অপরাধের দিকে না তাকিয়ে ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা পাওয়ার বিষয়টি মক্কার কুরাইশদের কল্পনাতেও ছিল না। বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় ও মক্কাবাসীদের ক্ষমা করা মহানবি (সা.) -এর উদারতার বহিঃপ্রকাশ। মহানবি (সা.)-এর চিন্তাচেতনা, মনমানসিকতা ও উদারতা ছিল অতুলনীয় ও অপরিমেয়। তিনি উদারতার যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন, তাঁর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তাঁর এরূপ উদারতা, মানবতাবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব সর্বকালের সবার জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

THANK YOU